POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023--2025

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (بقرہ:186)

কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইরে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না। এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়ায়েছন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(বাকারা: ১৮৬)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 8

সংখ্যা 16

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 20 ই এপ্রিল, 2023 28 রমযান 1444 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

রোযা বর্মস্বরূপ

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আঁহযরত (সা.) বলেছেন, মানুষের সমস্ত কাজ তার নিজের জন্য। কিন্তু রোযা আমার জন্য আর আমি স্বয়ং তার প্রতিদান হব। অর্থাৎ তার সেই পুণ্যের প্রতিদানে আমি তাকে নিজের দর্শন দিব। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, রোযা বর্ম স্বরূপ। অতএব, যখন তোমাদের মাঝে কেউ রোযা রাখে, তখন সে যেন অযথা কথাবার্তা না বলে আর চিৎকার চেঁচামেচি না করে। কেউ যদি তাকে গালি দেয় বা তার সঙ্গে ঝগড়া করে, তবে উত্তরে তার বলা উচিত 'আমি রোযা রেখেছি।' সেই সত্তার নামে শপথ করে বলছি যার হাতে মহম্মদের প্রাণ রক্ষিত আছে! রোযাদারের মুখে সুবাস আল্লাহ্ তা'লার নিকট মৃগনাভির থেকে অধিক পবিত্র এবং সুখকর। রোযাদারের জন্য দুটি আনন্দ নির্ধারিত রয়েছে। একটি আনন্দ সে সেই সময় লাভ করে যখন সে রোযা থেকে ইফতার করে। এবং দ্বিতীয় আনন্দটি সেই সময় লাভ হবে যখন রোযার কারণে সে আল্লাহ্ তা'লার সাক্ষাত লাভ করবে।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড, কিতাবু সওম, কাদিয়ান থেকে মুদ্রিত)

জুমআর খুতবা, ১৭ ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩
সফর বৃত্তান্ত (যুক্তরাষ্ট্র)
প্রশ্নোত্তর পর্ব

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ

তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ؕ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ؕ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۝ (بقرہ: 186-187)

রমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়াত ও ফুরকান (হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়স সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহ্‌র মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

এবং যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন (বল) 'আমি নিকটে আছি।' আমি প্রার্থনাকারীর প্রার্থনার উত্তর দিই যখন সে আমার নিকট প্রার্থনা করে। সুতরাং তাহারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমার উপর ঈমান আনে যাহতে তাহারা সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়।' (সূরা বাকারা: ১৮৬-১৮৭)

প্রতিটি জিনিস খোদা তা'লার নিকট যাচনা করা উচিত। খোদা সর্বশক্তিমান, তিনি চাইলে অসুস্থ ব্যক্তিকেও রোযা রাখার সামর্থ দান করতে পারেন।

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর বাণী

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

সামর্থ্য অনুসারে খোদা নির্দেশিত ফরজ পালন করা মানুষের কর্তব্য। রোযা সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন- وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা রোযা রাখ তবে তোমাদের জন্য অত্যন্ত কল্যাণকর।

একবার আমার মনে এই ধারণার উদ্রেক হল যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হয়েছে?আমি বুঝতে পারলাম যে, তৌফিক লাভের জন্য, যাতে এর দ্বারা রোযার তৌফিক লাভ হয়। খোদা তা'লাই তৌফিক দান করেন আর প্রত্যেকটি জিনিস খোদা তা'লার কাছেই যাচনা করা উচিত। খোদা সর্বশক্তিমান, তিনি চাইলে অসুস্থ ব্যক্তিকেও রোযা রাখার সামর্থ দান করতে পারেন। ফিদিয়া দানের উদ্দেশ্য সেই শক্তি ও সামর্থটুকু অর্জন করা। আর সেটা খোদা তা'লার কৃপা ও অনুগ্রহে লাভ হয়। অতএব, আমার নিকট এতটুকুই যথেষ্ট যে, মানুষ যেন এই দোয়া করে যে, হে খোদা! এটা তোমার আশিসময় মাস, এর থেকে বঞ্চিত হতে চলেছি, জানি না আগামী বছর জীবিত থাকব কি না, কিম্বা এই পরিত্যক্ত রোযাগুলি পালন করতে পারব কি না। (এই অনুনয়ের পর) যদি সে খোদার কাছে তৌফিক চায়, তবে আমার বিশ্বাস, এমন হৃদয়কে খোদা তা'লা শক্তি দান করবেন।

খোদা চাইলে অন্যান্য জাতির মত এই জাতির জন্য কোনও বিধিনিষেধ রাখতেন না। কিন্তু তিনি বিধিনিষেধ রেখেছেন কল্যাণার্থে। আমার মতে প্রকৃত বিষয় এটাই যে, মানুষ যখন সততা এবং পূর্ণ নিষ্ঠাসহকারে খোদার দরবারে এই নিবেদন করে যে, এই মাসে আমাকে বঞ্চিত রেখো না, তখন খোদা তা'লা তাকে বঞ্চিত রাখেন না। আর এমতাবস্থায় মানুষ যদি রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে যায়,তবে সেই অসুস্থতা তার জন্য কৃপা হয়ে দাঁড়ায়। কেননা প্রতিটি কর্ম তার উদ্দেশ্যের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি রোযা থেকে বঞ্চিত থাকে কিন্তু অন্তরে এই বেদনা ছিল যে, যদি সুস্থ থাকতাম আর রোযা রাখতে পারতাম! আর সেই অসুস্থতার জন্য সে দুঃখিত হয়, তবে ফিরিশতারা তার জন্য রোযা রাখবেন। তবে শর্ত হল সে যেন সুযোগসন্ধানী না হয়। এমনটি হলে খোদা তা'লা তাকে মোটেই পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখবেন না।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫৬৩)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর, ২০২২

সাংবাদিক রিশি রশীদ সাহেবা হুযুর আনোয়ারের সাক্ষাতকার।

* সাংবাদিকের প্রথম প্রশ্ন: আপনারা নিজেদেরকে আহমদী জামাত কেন বলেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: মহানবী (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইসলামের উপর এমন এক যুগ আসবে যখন মুসলমান ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ভুলে যাবে এবং ইসলামের কেবল নামটুকুই অবশিষ্ট থাকবে। কুরআন করীম নিজের প্রকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকবে ঠিকই, কিন্তু এর উপর আমল হবে না এবং কুরআন করীমের অপব্যাখ্যা করা হবে। যখন এমন যুগ আপতিত হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের পথ-প্রদর্শনের জন্য মসীহ ও মাহদীকে আবির্ভূত করবেন। আমাদের বিশ্বাস, এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ইসলামের পুনর্জীবনের জন্য যে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমণ নির্ধারিত ছিল, তিনি এসে গেছেন এবং আঁ হযরত (সা.) মসীহ ও মাহদীর আগমণের যে সমস্ত নিদর্শনাবলী বলেছিলেন সেগুলি সব পূর্ণ হয়েছে।

অপরাপর মুসলমানরা বলে যে, মসীহ ও মাহদী ভিন্ন ভিন্ন সত্তা। মসীহ আকাশে বসে আছেন আর শেষ যুগে আসবেন। আর মাহদী এখনও আবির্ভূত হন নি। অপর দিকে আমরা বলি যে, মসীহ ও মাহদী এক ও অভিন্ন সত্তা এবং আঁ-হযরত (সা.) আগমণকারী মসীহ ও মাহদীকে এক ও অভিন্ন সত্তা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

আমরা বলি যে, পৃথিবীতে আগমণকারী ব্যক্তি হাজার হাজার বছর পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাভাবিক আয়ু পেয়ে মৃত্যু বরণ করে। আমরা বলি, যদি এত দীর্ঘকাল জীবিত থাকার অধিকার কারো ছিল তবে তা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর ছিল। আমরা বলি, হযরত ঈসা মৃত্যু বরণ করেছেন এবং যে মসীহর আগমণ নির্ধারিত ছিল তিনি তাঁর 'মসীল' বা সদৃশ হয়ে আসতেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এটিও ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, আগমণকারী মসীহ ও মাহদী এসে নিজের এক জামাত গঠন করবেন। আঁ-হযরত (সা.) এও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ইহুদীরা বিভিন্ন ফির্কায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, অনুরূপে ইসলামেও বিভিন্ন ফির্কার উদ্ভব হবে। আর এর মধ্যেই কেবল একটিই ফির্কা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার উপর আমল করবে আর সেটি একটি জামাত হবে। এই কারণেই আমরা নিজেদেরকে জামাতে আহমদীয়া বলে পরিচয় দিয়ে থাকি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: আমরা যখন এখানে কোন অনুষ্ঠানে শিয়া ও সুন্নী ইমাম ও স্কলারদেরকে আহ্বান করি এবং বলি যে, এই অনুষ্ঠানে জামাত আহমদীয়ার প্রতিনিধিকেও আহ্বান করতে চাই, তখন তারা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এরা আপনাদেরকে নিজেদের মত মুসলমান হিসেবে গণ্য করে না।

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ-হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে, তোমাদের মধ্যে ততদিন নবুয়ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতদিন আল্লাহ্ তা'লা চাইবেন। এরপর তিনি তা উঠিয়ে নিবেন এবং নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। অতঃপর ঐশী তকদীর অনুযায়ী অন্যায়-অত্যাচারে রাজত্ব কায়েম হবে। (আর এই যুগ ৩০০ বছর পর্যন্ত বিস্তৃত থাকবে) এরপর আরও পূর্বাপেক্ষা অধিক অত্যাচারের সাম্রাজ্যের সূচনা হবে। (আর এই অন্ধকারের যুগ এক হাজার বছর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে) অতঃপর আল্লাহ্ তা'লার করুণা উদ্বেলিত হবে এবং পুনরায় নবুয়তের পদ্ধতিতে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে বা চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে আগমণকারী মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাব নির্ধারিত ছিল। আমরা বলি, তিনি এসে গেছেন, অপর দিকে এরা বলে, এখনও আসেন নি।

আমরা বলি, আগমণকারী নবী হবেন। তিনি নবী আর আঁ-হযরত (সা.) একটি হাদীসে চার বার তাকে 'নবীউল্লাহ্' (আল্লাহ্‌র নবী) বলে সম্বোধন করেছেন। আর তিনি আঁ-হযরত (সা.)-এর শরীয়ত নিয়ে এসেছেন, কোন নতুন শরীয়ত নিয়ে আসেন নি। সেই একই কুরআন এবং ইসলামী শিক্ষা, নতুন কোন শিক্ষা নয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি প্রতিরূপ হিসেবে নবী হবেন। অপরদিকে অন্যরা বলে যে, তিনি কোন প্রকারের নবী নন। তাই তাদের এবং আমাদের মাঝে এই মতভেদ রয়েছে।

আপনারা যদি বলেন যে, মহানবী (সা.)-এর পর কোন নবী আসতে পারে না। এটি খোদা তা'লার গুণাবলী এবং অধিকারকে শেষ করার নামান্তর। এমন কাজ করার অধিকার কোন মানুষের নেই। এই কারণে অন্য মুসলমানরা আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে স্বীকার করে না।

তারা বলে, আমরা মুসলমান নই কারণ, আমাদের বিশ্বাস হল জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী আল্লাহ্‌র নবী। আমরা বলি, আমাদের বিশ্বাস হল, হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) খোদা তা'লার নবী এবং তাকে নবীর এই উপাধি আঁ-হযরত (সা.) স্বয়ং দিয়েছেন। তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত দাসত্ব ও অনুবর্তিতায় নবীর মর্যদায় অধিষ্ঠিত।

সাংবাদিক বলেন, মুসলমানদের মৌলিক ধর্মবিশ্বাস হল আল্লাহ্ এক এবং মহম্মদ (সা.) তাঁর শেষ নবী।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি একথা বলবেন না যে, মহম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র শেষ নবী, বরং বলুন যে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লহ॥ অর্থাৎ আল্লাহ্ এক এবং মহম্মদ তাঁর রসুল। এই কলেমাতে তিনি শেষ নবী বলে উল্লেখ নেই।

আর যতদূর শেষ নবীর সম্পর্ক, কুরআন তাঁকে 'খাতামুন নাবীঈন' বলেছে। আমরা অন্যদের থেকে এর সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ করে থাকি। অর্থাৎ এর অর্থ হল নবীগণের মোহর বা সীল। আমরা এর অর্থ করি মোহর। অর্থাৎ তাঁর মোহর ছাড়া অন্য কোন নতুন নবী আসতে পারে না। তবে তাঁর মোহর নিয়ে আসতে পারে। কুরআন করীম শরীয়তের শেষ গ্রন্থ। এখন আর কোন নতুন শরীয়ত আসতে পারে না। হযরত মহম্মদ-ই (সা.) হলেন শরীয়তধারী শেষ নবী।

অন্যরা খাতামান নাবীঈনের অর্থ করে যে, তিনি (সা.) মোহর লাগিয়ে নবীর উপাধি সীল করে দিয়েছেন। অর্থাৎ নবী আসার দরজা বন্ধ হয়ে গেছে।

হুযুর বলেন: খোদা তা'লার গুণাবলীকে সীমিত করে দেয় এবং তাঁর অধিকার ও ক্ষমতাকে বাধা দেয় এমন পদ্ধতিতে কোন আয়াতের ব্যাখা করার অধিকার কোন মানুষের নেই।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন: অন্য মুসলমানরা যখন আপনাদেরকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করে না, তখন আপনারা কেমন অনুভব করেন। অথচ আপনাদের মসজিদও রয়েছে, একই কুরআনের তিলাওয়াত করেন এবং আঁ-হযরত (সা.)এর উপর বিশ্বাস রাখেন। এসব কিছু সত্ত্বেও অন্যরা আপনাদেরকে মুসলমান মনে করে না কেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ-হযরত (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, যেভাবে ইহুদীরা হযরত ঈসাকে গ্রহণ করে নি, অথচ তওরাতে তাঁর আগমণ সম্পর্কে ভুরিভুরি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। অনুরূপভাবে এই শেষ যুগে আগমণকারী নবী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর পথেও মুসলমানদের পক্ষ থেকে সমূহ বাধাবিপত্তি তৈরী করা হবে আর একের পর এক নিদর্শন পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিরোধীরা তাঁকে গ্রহণ করবে না।

হুযুর বলেন: এই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও আমরা ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বিস্তার ঘটাচ্ছি যার ফলে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন।

হুযুর বলেন: আপনি লক্ষ্য করুন যে, ১৮৮৯ সালে এক ব্যক্তি কাদিয়ানের মত ক্ষুদ্র জনপদে মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবী করল এবং ঘোষণা করল যে, আমি সেই মসীহ ও মাহদী যার আগমণ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। এই ঘোষণার সময় তিনি ছিলেন একা ও নিঃসঙ্গ। পরে মানুষ তাঁর সঙ্গ দিতে শুরু করে এবং ১৯০৮ সালে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন তিনি এক বিরাট জামাত রেখে যান যার সদস্য ছিল প্রায় ৪ লক্ষ। সেই সকল অনুগামীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ভারত এবং বর্তমান পাকিস্তানের। অতঃপর আরব দেশসমূহ থেকেও অনেক মানুষ তাঁর অনুগামী হয় এবং জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুরূপভাবে অন্যান্য দেশ থেকে যেমন ইন্ডোনেশিয়া থেকে হাজার হাজার সংখ্যায় মানুষ জামাতে প্রবেশ করে। মালেয়েশিয়া ও আরব দেশসমূহ থেকেও ক্রমশঃ মানুষ জামাতে যোগ দিতে থাকে।

হুযুর বলেন: জামাতে প্রবেশকারী এই সমস্ত মানুষরা যদি জানল যে, আমরা ইসলামের সঠিক শিক্ষার প্রসার করছি না, আঁ-হযরত (সা.)কে যথাযোগ্য মর্যাদা দিচ্ছি না এবং খাতামান্নাবীঈনের সঠিক অর্থ করছি না , তবে মুসলমানদের মধ্য লক্ষ লক্ষ মানুষ আমাদের সঙ্গে কেন যোগ দিচ্ছে? এই ভাবে আমাদের জামাতের জনসংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন জামাত এভাবেই উন্নতি করে। আমাদের বিশ্বাস, আমরা একদিন অবশ্যই সফল হব, জয়যুক্ত হব। এখন বলুন তো, ইহুদীরা কি খ্রীষ্টধর্মকে গ্রহণ করেছিল? ৩০০ বছর পর খৃষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

যুগ খলীফার বাণী

আপনাদের সব সময় মনে রাখতে হবে যে জামাতের উন্নতি, ইসলামের পুনরুত্থান এবং বিশ্ব-শান্তি লাভ অবশ্যই মূলত খিলাফতে আহমদীয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত। **(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)**

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

জুমআর খুতবা

এই নিদর্শন শুধু কুরআন শরীফেরই রয়েছে, প্রাঞ্জল ও বাগ্মিতাও রয়েছে, সত্যও রয়েছে এবং প্রজ্ঞার কথাও রয়েছে। যেসব বিষয়ে খিষ্টানরা গর্ব করে সেই সমস্ত সততা স্থায়ীভাবে এবং একান্ত উৎকর্ষের সাথে পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান। হাদীস বিচারক নয় বরং কুরআন হাদীসের ওপর বিচারক।

(হযরত মসীহ মওউদ)

পবিত্র কুরআনে যেসব ঐশী নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো মহানবী (সা.) বাস্তবে করেও করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। (আমাদের সামনে) যদি এই আদর্শ না থাকতো তাহলে ইসলাম বোঝা সম্ভব হতো না; কিন্তু মূল হলো কুরআন।

(হযরত মসীহ মওউদ)

পবিত্র কুরআনের বিশেষত্ব হলো, এর মাঝে সমস্ত শব্দ এমন মতির ন্যায় গাঁথা হয়েছে এবং নিজ অবস্থানে রাখা হয়েছে যা এক স্থল থেকে উঠিয়ে অন্য স্থলে রাখা যায় না আর কোনোটাকে অন্য শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না কিন্তু এতদসত্ত্বেও এর ছন্দমিল এবং বাগ্মিতা এবং ভাষাশৈলীর সকল আবশ্যকীয় বিষয় এতে উপস্থিত।"

এই মুহূর্তে এমন কোনো ধর্ম নেই যার অনুসারীরা এই দাবী করতে পারে যে, তারা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে অথবা তাদের দ্বারা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শিত হয় তাই এ দিক দিয়ে পবিত্র কুরআনের মু'জিযা সকল ধর্মগ্রন্থের তুলনায় অধিক উন্নত।

এই গর্ব কেবল কুরআন শরীফের আছে। একদিকে এটি অন্যান্য মিথ্যা ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করে, তাদের ভুল শিক্ষা উন্মোচন করে আর পক্ষান্তরে আসল ও সত্য শিক্ষাও উপস্থাপন করে।"

"কুরআন করীম একটি সহজবোধ্য গ্রন্থ।"

"সহজ, সরল ও সত্য যুক্তিবিজ্ঞান সেটিই যা পবিত্র কুরআনে আছে, এর মাঝে কোনোরূপ জটিলতা নেই। একেবারে সরল পথ যা খোদা তা'লা আমাদেরকে শিখিয়েছেন। যে বিষয়গুলো বলার, আমল করার, সেগুলো দেখবে আর যেসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোও দৃষ্টিতে রাখবে, সেগুলো পৃথক রাখবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে। আর এর মাধ্যমে সে নিজ খোদাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে।"

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত ৩ রা মার্চ, ২০২৩, এর জুমুআর খুতবা (৩ আমান ১৪০২ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহহুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,আজকাল খুতবায় পবিত্র কুরআনের সৌন্দর্যের বর্ণনা করছি, গুণাবলীর উল্লেখ করছি। এর (অর্থাৎ কুরআনের) সৌন্দর্য এবং গুণাবলীর বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণ গ্রন্থ – এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, আমি সত্য বলছি যে, পবিত্র কুরআন এমন পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক গ্রন্থ যে, (অন্য) কোনো গ্রন্থ এর মোকাবিলা করতে পারে না। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, বেদে এমন কোনো শ্লোক আছে কী যা هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ এর মোকাবিলা করতে পারে? যদি মৌখিক স্বীকারোক্তি বলে কিছু থেকে থাকে, অর্থাৎ এর ফলাফল ও পরিণামের কোনো প্রয়োজন না থাকে, তাহলে পুরো জগৎই কোনো না কোনোভাবে খোদা তা'লার স্বীকারোক্তি প্রদান করে এবং ভক্তি ও ইবাদত আর সদকা ও খয়রাতকেও ভালো মনে করে। অধিকন্তু কোনো না কোনোভাবে এসব কথার ওপর আমলও করে। তাহলে বেদ এসে পৃথিবীকে (নতুন) কী দিয়েছে? এখান পর্যন্ত তিনি হিন্দুদেরকে এই উত্তর দিচ্ছিলেন। হয় এটি প্রমাণ করো যে, যেসব জাতি বেদকে মান্য করে না তাদের মাঝে পুণ্য সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত অথবা অন্য কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নিদর্শন দেখাও। তিনি বলেন, (আল্লাহ্ তা'লা) পবিত্র কুরআনের সূচনাতেই সেসব উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা প্রকৃতিগতভাবে আত্মার দাবি। অতএব সূরা ফাতেহাতেই اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ -এর শিক্ষা প্রদান করে তিনি বলেন, তোমরা এই দোয়া করো যে, হে আল্লাহ্! আমাদেরকে সোজা পথের পানে হেদায়েত দাও , (অর্থাৎ এই দোয়াও শিখিয়েছেন আর হেদায়েত দেওয়ার দোয়া যখন শিখিয়েছেন তখন এর অর্থ হলো এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে, আমি সোজা পথে পরিচালিত করব। এরপর তিনি বলেন,) সেই সোজা পথের পানে যা তাদের পথ যাদের প্রতি তোমার পুরস্কার ও অনুগ্রহ বর্ষিত হয়েছে। আর এই দোয়ার সাথে সূরা বাকারার প্রথম আয়াতেই এই সুসংবাদ প্রদান করেছেন যে, ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ অর্থাৎ যদি হেদায়েতের দোয়া শিখিয়ে থাকেন তাহলে তা অর্জনের জন্য একটি কর্মপন্থাও বলে দিয়েছেন যে, এর ওপর আমল করো। এটি হলো (সেই) গ্রন্থ যার ওপর আমল করলে তোমরা অর্থাৎ মুত্তাকীরা হেদায়েত পাবে। মোটকথা রূহ বা আত্মা দোয়া করে আর একইসাথে দোয়ার গৃহীত হওয়া নিজ প্রভাব প্রদর্শন করে। আর দোয়া গৃহীত হওয়ার সেই প্রতিশ্রুতি পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে পূর্ণ হয়। একদিকে দোয়া রয়েছে আর অপরদিকে এর ফলাফলও উপস্থিত রয়েছে। এটি খোদা তা'লার একান্ত অনুগ্রহ ও কৃপা যা তিনি করেছেন। কিন্তু পরিতাপ জগদ্বাসী এ সম্পর্কে অনবহিত ও উদাসীন আর এটি থেকে দূরে থেকে ধ্বংস হচ্ছে। "

এরপর তিনি বলেন, "আমি পুনরায় বলছি, খোদা তা'লা পবিত্র কুরআনের শুরুতে মুত্তাকীদের যে বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন সেগুলোকে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত রেখেছেন। কিন্তু মানুষ যখন পবিত্র কুরআনের ওপর ঈমান আনয়ন করে সেটিকে নিজ হেদায়েতের জন্য সংবিধান নির্ধারণ করে তখন সে হেদায়েতের সেসব সর্বোচ্চ স্তর ও মর্যাদা লাভ করে যা হুদাল্লিল মুত্তাকীন এর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের এই 'ইল্লতে গায়ী' তথা উদ্দেশ্যগত কারণের কথা চিন্তা করলে এমন স্বাদ ও প্রশান্তি লাভ হয় যা আমরা ভাষায় বর্ণনা করতে পারি না, কেননা এর মাধ্যমে খোদা তা'লার বিশেষ কৃপা ও পবিত্র কুরআনের উৎকর্ষের সন্ধান পাওয়া যায়।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩১৭-৩১৮)

এরপর পবিত্র কুরআনের শিক্ষা একটি পরিপূর্ণ শিক্ষা– এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, যুগ মহানবী (সা.)-এর আবির্ভাবের প্রয়োজনীয়তার

আরেকটি প্রমাণ আর (এর) পরিণতি اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ –এর মাঝে বলা হয়েছে। অর্থাৎ তৎকালীন যুগ বা তখন পৃথিবীর যে অবস্থা ছিল তা মহানবী (সা.)-এর আগমনের (প্রয়োজনীয়তার) প্রমাণ, কেননা তখন প্রয়োজন ছিল। আর এরপর সেই আবির্ভাবের পরিণতি কী হয়েছে, শিক্ষা কীভাবে পূর্ণ হয়েছে তা اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ –এর মাঝে বলা হয়েছে। তিনি বলেন, এই দ্বার যেন নবুওয়্যতের দ্বিতীয় ফসল। পূর্ণতার অর্থ কেবল এটি নয় যে, বিভিন্ন সূরা অবতীর্ণ করলাম। বরং আত্মার পরিপূর্ণতা এবং হৃদয়ের পরিশুদ্ধতাও করেছেন। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন, শিক্ষা দিয়েছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, কেবল এটিই উৎকর্ষ নয়, বরং উৎকর্ষ হলো এই যে, মানুষের আত্মার অবস্থাকেও পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন। যারা আমলকারী রয়েছে তাদেরকে পরিপূর্ণ মানব বানিয়ে দিয়েছেন। আত্মার পরিশুদ্ধি করেছেন, তাদের হৃদয় সমূহকে পবিত্র করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, বন্য জন্তু থেকে মানুষ, এরপর বুদ্ধিমান ও চরিত্রবান মানুষ, আর এরপর আল্লাহ্ওয়ালা মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন এবং আত্মার পরিশুদ্ধি করেছেন। আর আত্মার পরিশুদ্ধি এবং আত্মার পূর্ণতা ও পরিচ্ছন্নতার স্তরসমূহ অতিক্রম করিয়েছেন। মানুষকে সভ্যতারও সর্বোন্নত স্তরসমূহ শিখিয়ে দিয়েছেন। আত্মাকে পবিত্র করারও সর্বোন্নত স্তরসমূহ শিখিয়ে দিয়েছেন এবং সেগুলোকে চূড়ান্ত স্তরেও উপনীত করেছেন। আর একইভাবে আল্লাহ্র কিতাবকেও পূর্ণ ও সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, এমনকি এমন কোনো সততা ও সত্য নেই যা পবিত্র কুরআনে অনুপস্থিত। আমি অগ্নিহোত্রিকে বহুবার বলেছি। তিনি হিন্দুদের ধর্মীয় সংগঠনের একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। প্রথমে একটি ফিরকায় ছিলেন, এরপর নিজের ফিরকা বা সংগঠন আরম্ভ করেন। যাহোক, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর সাথে তার বেশ বিতর্ক হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, আমি তাকে বহুবার বলেছি যে, এমন কোনো সততার কথা বলো যা পবিত্র কুরআনে অনুপস্থিত। কিন্তু সে বলতে পারেনি। অনুরূপভাবে এক যুগে আমার মনে হলো, আমি বাইবেলকে সামনে রেখে দেখি। যেসব বিষয়ে খিষ্টানরা গর্ব করে সেই সমস্ত সততা স্থায়ীভাবে এবং একান্ত উৎকর্ষের সাথে পবিত্র কুরআনে বিদ্যমান। কিন্তু পরিতাপ যে, মুসলমানদের এদিকে কোনো মনোযোগ নেই। তারা পবিত্র কুরআনের প্রতি প্রণিধানই করে না আর না তাদের হৃদয়ে (এর) কোনো সম্মান আছে। নতুবা এটি তো এমন গর্বের বিষয় যে, এর কোনো দৃষ্টান্ত অন্যদের মাঝে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। তিনি বলেন, মোটকথা اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ - আয়াতটির দুটি দিক রয়েছে। একটি হলো এই যে, তোমাদের পরিশুদ্ধ করেছি। অর্থাৎ তোমাদেরকে পবিত্র করে দিয়েছি। দ্বিতীয়ত কিতাব সম্পূর্ণ করেছি । অর্থাৎ পরিপূর্ণ শরীয়ত তথা জীবনবিধান তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি। তিনি বলেন, বলা হয় যে, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয় সেটি ছিল জুমুআর দিন। হযরত উমর (রা.)-কে কোনো এক ইহুদি বলে যে, এই আয়াতঅবতীর্ণ হওয়ার দিনে তো তোমাদের ঈদ করা উচিত ছিল। এটি এমন পরিপূর্ণ ও প্রভাব বিস্তারী আয়াত যে, এই আনন্দে তো সেদিন ঈদ হওয়া উচিত ছিল। এক ইহুদি হযরত উমরকে এই কথা বলে। হযরত উমর বলেন, জুমুআ তো ঈদই। জুমুআর দিন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তো জুমুআ ঈদই বটে। কিন্তু বহু মানুষ এই ঈদ সম্পর্কে অনবগত। অন্যান্য ঈদে তারা নতুন কাপড় পড়ে কিন্তু এই ঈদের পরোয়া করে না আর ময়লা কাপড় পরিহিত অবস্থায় চলে আসে। এখানে তিনি জুমুআর গুরুত্বও স্পষ্ট করেন যে, জুমুআ আদায় করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, আমার মতে এই ঈদ অন্যান্য ঈদের চেয়েও উত্তম। অর্থাৎ জুমুআর জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা এবং আয়োজন করা উচিত জুমুআর নামাযে অংশ নেওয়ার জন্য। শুধু বছর শেষে ঈদের নামায পড়াই যথেষ্ট নয়। তিনি বলেন, এই ঈদের জন্যই সূরা জুমুআ রয়েছে। আর এর জন্যই কসর নামায রয়েছে। আর জুমুআ হলো সেটি যাতে আসরের সময় আদমের জন্ম হয়েছে। আর এই ঈদ এই যুগেরও প্রমাণ বহন করে যে, প্রথম মানব এই ঈদেই জন্ম নিয়েছে। পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হওয়া এই দিনেই শেষ হয়েছে। ” (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৯৯)

এরপর পবিত্র কুরআন হাদীসের ওপর বিচারক-এই বিষয়টি স্পষ্ট করতে গিয়ে তিনি বলেন, “আরেকটি ভ্রান্তি অধিকাংশ মুসলমানের মাঝে রয়েছে যে, তারা হাদীসকে পবিত্র কুরআনের ওপর প্রাধান্য দেয়, অথচ এটি সঠিক নয়। পবিত্র কুরআন সুনিশ্চিত বিশ্বাসের মর্যাদা রাখে আর হাদীসের অবস্থান হলো অনুমাননির্ভর। (অর্থাৎ, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো সুনিশ্চিত শিক্ষা, কিন্তু হাদীসকে আমরা দ্ব্যর্থহীন বলতে পারি না; এর অনেক রেওয়ায়েত পরবর্তীকালে সংকলন করা হয়েছে।) তিনি (আ.) বলেন, হাদীস বিচারক নয় বরং কুরআন হাদীসের ওপর বিচারক। (সিদ্ধান্ত প্রদান করা কুরআনের কাজ।) তবে, হাদীস পবিত্র কুরআনের ব্যাখ্যা। (অনেক হাদীস রয়েছে যা থেকে কুরআনের আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।) হাদীসকে নিজের অবস্থানে রাখা উচিত। হাদীসকে সেই পর্যায় পর্যন্ত মানা উচিত যেন তা পবিত্র কুরআনের বিরোধী সাব্যস্ত না হয়, বরং তার অনুগামী হয়। কিন্তু যদি তা কুরআনের বিপরীত হয় তবে সেটি হাদীস নয় বরং পরিত্যাজ্য কথা। তবে পবিত্র কুরআন অনুধাবনের জন্য হাদীসের প্রয়োজন। (তবে একথাও স্মরণ রেখো, হাদীসসমূহের মধ্যে এমন অনেক হাদীস রয়েছে যেগুলো দ্বারা কোনো কোনো আয়াতের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়; এগুলো কতিপয় বুযূর্গ সাহাবীর রেওয়ায়েত। তাই এগুলো অনুধাবনও করা প্রয়োজন, কিন্তু এটি লক্ষ্য রাখবে; হাদীস যেন পবিত্র কুরআনের বিরোধী না হয়।) পুনরায় তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে যেসব ঐশী নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে সেগুলো মহানবী (সা.) বাস্তবে করেও করিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এবং একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন। (আমাদের সামনে) যদি এই আদর্শ না থাকতো তাহলে ইসলাম বোঝা সম্ভব হতো না; কিন্তু মূল হলো কুরআন। কোনো কোনো (আহলে কাশ্ফ বা) দিব্যদর্শী সরাসরি মহানবী (সা.) -এর কাছ থেকে এমন কিছু হাদীস শুনেছেন যা অন্যরা জানতে পারে নি, কিংবা তারা বিদ্যমান বিভিন্ন হাদীসের সত্যায়ন করিয়ে নেন। ” (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩৬৩-৩৬৪)

[হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজের সম্পর্কেও লিখেছেন, ‘আমিও কোনো কোনো হাদীস মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে সরাসরি শুনেছি।’]

(সীরাতুল মাহদী,১ম খণ্ড, পৃ: ৫৫০, রেওয়ায়েত নম্বর- ৫৭২)

কুরআনের বাগ্মীতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে পুনরায় তিনি (আ.) বলেন,

“ পবিত্র কুরআন ভাষার নিরিখে এতটা বাগ্মীতা, ভারসাম্য, সূক্ষ্মতা, কোমলতা ও প্রভাব -প্রতিপত্তি রাখে যে, যদি কোনো কঠোর সমালোচক এবং চরম ইসলাম-বিরোধী যে আরবী রচনা ও সাহিত্যে পূর্ণ দক্ষতা রাখে, তাকে ক্ষমতাশীল শাসকের পক্ষ থেকে কঠোর নির্দেশ দেওয়া হয় যে, যদি তুমি (উদাহরণস্বরূপ) বিশ বছর সময়ের ভেতর যা বলতে গেলে এক জীবনকাল সময়, এভাবে পবিত্র কুরআনের সমতুল্য কিছু উপস্থাপন না করো যে, কুরআনের যে-কোনো স্থান থেকে মাত্র দুই-চার ছত্রের কোনো বিষয় নিয়ে সেটিরই অনুরূপ বা তার চাইতে উত্তম কোনো বাক্য গঠন করে নিয়ে আসো যার মধ্যে সেই সবগুলো বিষয় সেগুলোর যাবতীয় সূক্ষ্মতত্ত্ব ও বাস্তবতাসহ বিদ্যমান থাকে এবং সেই বাক্যাবলীও কুরআনের মতোই প্রাঞ্জল ও বাগ্মিতাপূর্ণ হবে, তাহলে তোমাকে এই ব্যর্থতার দায়ে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে– তবুও সে চরম বৈরিতা, অপমানের শংকা ও মৃত্যুভয় সত্ত্বেও এর সমতুল্য কিছু রচনা করতে কখনোই সক্ষম হবে না, যদি সে শত-সহস্র ভাষাবিদ ও লেখকদের সাহায্য নেয় তবুও।” (বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড,পৃ: ২৮৬-২৯৭)

একদিকে তার জন্য ভয়ও রয়েছে, সেইসাথে শাসকের পক্ষ থেকে তাকে বিশ বছরের সময়ও দেওয়া হচ্ছে যে, পবিত্র কুরআনের অনুরূপ কোনো নযীর উপস্থাপন করার জন্য– কয়েকটি আয়াতই রচনা করে নিয়ে আসো, কয়েকটি ছত্রই রচনা করে নিয়ে আসো; কিন্তু তবুও সে উপস্থাপন করতে পারবে না। এটি হলো পবিত্র কুরআনের ও এর বাগ্মীতার শ্রেষ্ঠত্ব! তিনি (আ.) বলেন, এটি কথার কথা বা কোনো কাল্পনিক কথা নয়। বরং যখন পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে তখন থেকেই এই চ্যালেঞ্জ পৃথিবীর সামনে দেওয়া আছে যে, পারলে তোমরা (নযীর) উপস্থাপন করো। আজও কতিপয় ইসলাম-বিদ্বেষী কুরআনের নযীর উপস্থাপনের চেষ্টা করে। নিত্যদিন কোনো না কোনো কথা রটনা করে এবং দাবি করে যে, আমরা (কুরআনের) উপমা উপস্থাপন করছি; কিন্তু পবিত্র কুরআনের বাগ্মীতা ও ভাষাশৈলীর ধারেকাছেও পৌঁছতে পারে না, শুধু বৃথা বাগাড়ম্বর।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, বাগ্মীতা ও ভাষাশৈলীতে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব। উদাহরণস্বরূপ, সূরা ফাতিহায় বিদ্যমান বাক্যবিন্যাস বাদ দিয়ে অন্য কোনো বাক্যবিন্যাস ব্যবহার করলে সেই উচ্চাঙ্গীন অর্থ, তাৎপর্য ও মহান উদ্দেশ্য যা বিদ্যমান বাক্যবিন্যাসের মাঝে নিহিত রয়েছে, তা অন্য কোনো বিন্যাসে বর্ণনা করা অসম্ভব। যে কোনো দিক দিয়েই দেখো না কেন, তা “কুল হুয়াল্লাহু আহাদ” ই হোক না কেন। যতটা নম্রতা এবং শালীনতাকে দৃষ্টিতে রেখে এতে (যে) সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞান ও সত্যাসত্য রয়েছে তা অন্য কেউ বর্ণনা করতে পারবে না। এটিও কুরআনের একটি অনন্য নিদর্শন। আমার আশ্চর্য লাগে যখন কোনো কোনো নির্বোধ ‘মোকামাতে হারীরী’ অথবা ‘সাবায়ে মুয়ালেকাহ্’ (এগুলো দুটি পুস্তকের নাম) এগুলোকে অনন্য এবং অতুলনীয় মনে করে, (অর্থাৎ এগুলো অনেক উন্নতমানের গ্রন্থ, এর কোনো তুলনাই হয় না)। তিনি (আ.) বলেন, এভাবে পবিত্র কুরআনের অনন্যতার ওপর আক্রমন করতে চায় কিন্তু তারা এটুকুও জানে না যে, প্রথমত হারীরীর রচয়িতা কোথাও তার (গ্রন্থের) অতুলনীয় হওয়ার দাবী করে নি আর দ্বিতীয়ত হারীরীর লেখক স্বয়ং পবিত্র কুরআনের বাগ্মীতার নিদর্শনে বিশ্বাস রাখতো। এছাড়া আপত্তিকারকরা সত্য ও ন্যায়ের কথা মাথায় রাখে না বরং তা পরিহার করে শুধুমাত্র শব্দাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেয়। উপরোক্ত পুস্তিকাদী সত্য ও প্রজ্ঞাশূন্য। নিদর্শনের বৈশিষ্ট্য এবং কারণও এটিই যে, তা সকল প্রকার বিষয় দৃষ্টিতে রাখবে। বাগ্মীতা এবং প্রাঞ্জলতাও হাত ছাড়া না করে, সত্যতা এবং প্রজ্ঞাও উপেক্ষা করে না। এই মু’জেযা বা নিদর্শন শুধুমাত্র পবিত্র কুরআনেরই রয়েছে (অর্থাৎ বাগ্মিতা এবং প্রাঞ্জলতাও রয়েছে, সত্যতা এবং প্রজ্ঞার কথাও রয়েছে।) যা সুর্যের ন্যায় দেদীপ্যমান এবং সকল দিক থেকে নিজের মাঝে অলৌকিক নিদর্শনের শক্তি রাখে।” (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮৪-৮৫)

তিনি (আ.) পুনরায় বলেন, পবিত্র কুরআনের নিদর্শন অর্থাৎ বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতার উত্তরে একবার পাদ্রী ফান্ডার ‘হারীরী ও আবুল্ ফযল’ এবং বিভিন্ন ইংরেজী পুস্তক উপস্থাপন করে। অনেক দিন আগের কথা। তখনও আমরা এটিই

ভেবেছিলাম যে, সে মিথ্যা বলছে। কেননা, প্রথমত এই লেখকরা কখনো এ দাবী করে নি যে, তাদের রচনা অতুলনীয় বরং তারা স্বয়ং সর্বদা নিজেদের অযোগ্যতার কথা স্বীকার করেছে এবং (তারা) পবিত্র কুরআনের প্রশংসা করেছে। দ্বিতীয়তঃ তাদের পুস্তকাদিতে অর্থ শব্দানুপাতে হয়ে থাকে। শুধুমাত্র শব্দাবলীর সংযোজন রয়েছে। ছন্দ মেলানোর জন্য একটি শব্দের বিপরীতে অন্য শব্দ চয়ন করা হয়। আর (তাদের রচনায়) প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের কোনো বালাই থাকে না। অপরদিকে পবিত্র কুরআনে সত্য ও প্রজ্ঞার আবশ্যকতা রয়েছে। (সত্যতাও রয়েছে প্রজ্ঞাও রয়েছে। শুধুমাত্র শব্দাবলীর সংযোজনই হয়নি। এতে সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়নি)। তিনি (আ.) বলেন, প্রকৃতপক্ষে এ বিষয়ের পূর্ণতার ক্ষেত্রে সত্য ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীর পাশাপাশি ছন্দও যেন যথার্থ হয়, এ বিষয়টি ঐশী সাহায্যেই অর্জিত হয়। (এটিই প্রকৃত বিষয় যে, সত্য ও প্রজ্ঞাও থাকবে আর ছন্দও যদি মিলে যায় তখন বুঝা যায় যে, (এক্ষেত্রে) ঐশী সাহায্য রয়েছে। নতুবা মানুষের বাণী তেমনই হয় যেমনটি হারীরী প্রভৃতির।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২০৫)

এরপর তিনি (আ.) এক বৈঠকে এ বিষয়ে আরো বলেন যে, এজাজুল মসীহ্‌র ব্যাখ্যা সম্পর্কে এটি আলোচনা হচ্ছিল যে, বিরুদ্ধবাদীদের মধ্য থেকে কাউকেই খোদা তা'লা এই শক্তি দেন নি যে, এর মোকাবিলা করতে পারে। (এই ব্যাখ্যার উল্লেখ হচ্ছিল। তখন) একটি সভায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,

"পবিত্র কুরআনের একটি নিদর্শন হওয়ার স্বপক্ষে দুটি দল রয়েছে। একটি তো খোদা তা'লা বিরুদ্ধবাদীদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়েছেন অর্থাৎ, সে সময় (এর) মোকাবিলায় তাদের কোনো কিছু করে দেখানোর সামর্থ্য হয় নি। আর দ্বিতীয় দল যেটি সঠিক, সত্য এবং নিষ্ঠাবানের দল আর আমাদেরও সেটিই দল। আর তা হলো, বিরুদ্ধবাদীরা স্বয়ং মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সামর্থ্য রাখে নি। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞান ও বুদ্ধি হরণ করা হয়েছিল। পবিত্র কুরআনের নিদর্শনাবলীর বিষয়টি আমাদের কুরআনের তফসীর থেকে খুব ভালো ভাবে অনুধাবন করা সম্ভব। হাজার হাজার বিরুদ্ধবাদী রয়েছে যারা আলেম, ফাযেল আখ্যায়িত হয়। অনেক আত্মাভিমান সৃষ্টিকারী বাক্যও বিভিন্ন বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে, কিন্তু কেউই এই নিদর্শনের মোকাবিলা করতে পারে নি। বিজ্ঞাপনে লেখা হয়েছে কিন্তু কেউ সে-সকল নিদর্শনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসে নি।" (মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১৮)

সুতরাং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তকাবলী এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও অধ্যয়ন করা উচিত যাতে কুরআন অনুধাবন করা যায়। অন্যত্র তিনি বলেন,

"আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনকে যে অলৌকিক নিদর্শন দিয়েছেন তা হলো উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক শিক্ষা এবং একটি সভ্যতা সৃষ্টির জন্য এর নীতি আর এর বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতা যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব না আর এমনই আলৌকিক নিদর্শণ হলো অদৃশ্যের খবর এবং ভবিষ্যদ্বাণীর। এ যুগের কোনো অভিজ্ঞ জাদুকর আদৌ এমনটি করার দাবী করতে পারে না। বাগ্মিতা ও প্রঞ্জলতাও আছে আবার অদৃশ্যের খবর তথা ভবিষ্যদ্বাণীও আছে। এটি তো কোনো জাদুকরও দেখাতে পারে না আর এমন কথা দাবীও করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের নিদর্শনাবলীকে সুস্পষ্ট পার্থক্য দান করেছেন যেন কোনো ব্যক্তির কোনোরূপ অভিযোগ-অনুযোগ করার সূযোগ না থাকে আর এভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজ নিদর্শণাবলী সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন যার মাঝে কোনোপ্রকার সন্দেহ বা সংশয় সৃষ্টির অবকাশ না থাকে।"

(মালফুযাত, ১০খণ্ড, পৃ: ১৭২)

এরপর পবিত্র কুরআনের বাগ্মিতা ও ভাষাশৈলীর বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"মানুষ ভাবে শব্দভাণ্ডারের মাঝেই আছে বাগ্মিতা বা ভাষাশৈলী আর এর মাঝে কাফিয়া (তথা ছড়া) বৈ আর কিছু থাকবে না। যেভাবে একজন আরব লিখেছেন যে, "সাফারতু ইলার রোম ওয়া আনা আলা জামালিন মালুমিন" আমি রোমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করি আর আমি এমন একটি উটের পিঠে সফর করি যার পেশাব বন্ধ ছিল। এখানে এই (মালুমিন) শব্দটি কেবল ছড়া মিলানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের বিশেষত্ব হলো, এর মাঝে সমস্ত শব্দ এমন মতির ন্যায় গাঁথা হয়েছে এবং নিজ অবস্থানে রাখা হয়েছে যা এক স্থল থেকে উঠিয়ে অন্য স্থলে রাখা যায় না আর কোনোটাকে অন্য শব্দ দ্বারা পরিবর্তন করা যায় না কিন্তু এতদসত্ত্বেও এর ছন্দমিল এবং বাগ্মিতা এবং ভাষাশৈলীর সকল আবশ্যকীয় বিষয় এতে উপস্থিত।" (মালফুযাত, ১০ খণ্ড, পৃ: ১৭২-১৭৩)

এরপর পবিত্র পবিত্র কুরআনের বাগ্মিতা ও ভাষাশৈলীর সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) এক বৈঠকে বলেন: যতটা অলৌকীকতা ও নিদর্শন এখানে প্রকাশিত হচ্ছে এটি মূলত মহানবী (সা.)-এর অলৌকিক নিদর্শন। আর এই ভবিষ্যদ্বাণীসমূহ পবিত্র কুরআনেরই ভবিষ্যদ্বাণী কেননা এটি তাঁর অনুসরণ এবং পবিত্র কুরআনের শিক্ষার ফলাফল। এই মুহূর্তে এমন কোনো ধর্ম নেই যার অনুসারীরা এই দাবী করতে পারে যে, তারা ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারে অথবা তাদের দ্বারা অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শিত হয় তাই এ দিক দিয়ে পবিত্র কুরআনের মু'জিযা সকল ধর্মগ্রন্থের তুলনায় অধিক উন্নত। তাঁর নিজের মু'জিযাসমূহও পবিত্র কুরআনের কারণেই এবং মহানবী (সা.)-এর অনুসরণের কারণেই লাভ হয়েছে।এরপর বলেন, (পবিত্র কুরআনের) বাগ্মিতা বা ভাষাশৈলীর উচ্চাঙ্গের আরো একটি দিক এবং এমন স্বীকৃত যে, ন্যায়পরায়ন শত্রুরাও এটি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। পবিত্র কুরআন চ্যালেঞ্জ করেছে, فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ (অর্থাৎ তোমরা এর অনুরূপ কোনো একটি সূরা এনে দেখাও) কিন্তু আজ পর্যন্ত কারো দ্বারা এটি সম্ভব হয় নি যে, এর অনুরূপ কিছু নিয়ে আসতে পারে। পবিত্র কুরআনের চ্যালেঞ্জ হলো, এর অনুরূপ কোনো একটি সূরা নিয়ে আসো। আরবের যারা ভাষাতত্ত্বে বিরাট বিরাট বাগ্মি ব্যক্তিত্ব ছিল আর বিশেষ দিনগুলোতে বড় বড় সমাবেশ করতো এবং সেখানে নিজেদের কাসিদা শুনাতো, তারাও এর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থ হয় নি। এরপর পবিত্র কুরআনের বাগ্মিতা ও প্রঞ্জলতা এমন নয় যে, সেখানে কেবল শব্দের প্রবাহের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে কিন্তু অর্থ উপেক্ষা করা হয়েছে বরং যেভাবে উচ্চতর শব্দমালা সুশৃঙ্খলভাবে সাজানো হয়েছে তেমনি সত্যতত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান এতে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ বর্ণনার কাজ মানুষের নয় যে, তারা সেই গূঢ়তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান বর্ণনা করবে এবং একইসাথে বাগ্মিতা ও রচনাশৈলীকেও দৃষ্টিপটে রাখবে।"

তিনি (আ.) বলেন, " একস্থানে আল্লাহ তা'লা বলেন, يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ (সূরা আল বাইয়্যেনা: ৩-৪) অর্থাৎ, তাদের নিকট এমন কিতাবসমূহ আবৃত্তি করে যার মাঝে গূঢ়তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ জ্ঞান রয়েছে। ব্যাকরণবিদ জানেন যে, ব্যাকরণগত দিক থেকে পবিত্র শিক্ষা এবং নৈতিক চরিত্র উভয় দৃষ্টিপটে রাখা অনেক কঠিন। আর পাশাপাশি এমন প্রভাব বিস্তারকারী ও চিত্তাকর্ষক শিক্ষা যা অনৈতিক স্বভাবকেও দূর করে দেখাবে এবং এর পরিবর্তে উন্নত গুণাবলী সৃষ্টি করবে। আরবের অবস্থা কারো অজানা নয়। তারা সকল নোংরামী ও পাপাচারের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়েছিল আর শত শত বছর ধরে তাদের অবস্থা এমন বিকৃত ছিল অথচ তাঁর কল্যাণ ও বরকতের এতটাই প্রভাব ছিল যে, মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে সারা দেশের চিত্র বদলে দিয়েছিলেন। এটি কেবল শিক্ষার প্রভাবই ছিল। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফের সবচেয়ে ছোটো সূরাটি নিয়ে যদি দেখা হয় তবে বুঝা যাবে যে, এর মাঝে বিদ্যমান বাগ্মিতা ও রচনাশৈলীর সৌন্দর্য ছাড়াও শিক্ষার ব্যক্তিগত গুণাবলী ও চরম সৌন্দর্য এতে প্রোথিত করা হয়েছে। সূরা ইখলাস -এর প্রতিই মনোযোগ দাও। তওহীদ-এর সকল স্তরকে বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে। ছোটো একটি সূরা কিন্তু তওহীদের সমস্ত বিষয় এতে বর্ণনা করা হয়েছে এবং সকল প্রকার শিরক -এর মূলোৎপাটন করেছে। একইভাবে সূরা ফাতিহার প্রতি মনোযোগ দাও। এই ছোটো সূরাটির কত মাহাত্ম্য যার মাত্র সাতটি আয়াত কিন্তু মূলত সমস্ত কুরআন শরীফের মজ্জা, সারাংশ এবং সূচীপত্র এটি। আর এর মাঝে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের, তাঁর দোয়ার গুণাবলীর প্রয়োজনীয়তা, সেগুলো গ্রহণের উপায়-উপকরণ, উপকারী দোয়া করার পদ্ধতি, ক্ষতিকর রাস্তা থেকে বেঁচে চলার দিকনির্দেশনা যেমন প্রদান করা হয়েছে তেমনি এখানে সারা পৃথিবীর সকল মিথ্যা ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। এই ছোটো সূরা ফাতিহার মাঝেই সমস্ত কথা এসে গিয়েছে। অধিকাংশ কিতাব ও ধর্মের অনুসারীদের দেখবে যে, তারা অন্যান্য ধর্মের খারাপ দিক ও ত্রুটি বর্ণনা করে থাকে আর অন্যান্য শিক্ষামালার সমালোচনা করে থাকে কিন্তু এই দোষ তুলে ধরার পর কোনো ধর্মের অনুসারী এর চেয়ে ভালো কোনো শিক্ষা উপস্থাপন করে না এবং দেখায় না যে, আমি যদি অমুক খারাপ কাজ থেকে বাঁচতে চাই তবে এর পরিবর্তে এই ভালো শিক্ষা দিচ্ছি। এ বিষয়টি কোনো ধর্মে নেই। এই গর্ব কেবল কুরআন শরীফের আছে। একদিকে এটি অন্যান্য মিথ্যা ধর্মকে বাতিল ঘোষণা করে, তাদের ভুল শিক্ষা উন্মোচন করে আর পক্ষান্তরে আসল ও সত্য শিক্ষাও উপস্থাপন করে।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬-৪৮)

এটি এমন এক সৌন্দর্য যাকে বর্তমানের নামসর্বস্ব শিক্ষিত মানুষও মলীন করতে পারে না। অনেক স্থানে আমি দেখেছি, অন্যদের সামনে যখন কুরআন শরীফের শিক্ষানুযায়ী কোনো বিষয়ের সমাধান করা হয় তখন সে তা স্বীকার করে। কুরআন করীমের গুণাবলী বর্ণ না করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন,

"কুরআন একটি সহজবোধ্য কিতাব। তিনি (আ.) বলেন, কতক নাদান ব্যক্তি বলে, আমরা কুরআন শরীফ বুঝতে অক্ষম। এটি কঠিন বিষয়- এমনটি মনে করে এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ না করা উচিত নয়। এটি তাদের ভুল। একটি অজুহাত তৈরি করে দিল যে, এটি অর্থাৎ কুরআন শরীফ বুঝা অনেক কঠিন তাই এর প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। পড়ে নিলাম, ব্যাস এতেই চলবে। তিনি (আ.) বলেন, কুরআন শরীফ বিশ্বাসগত বিষয়সমূহকে এমন বাগ্মিতাপূর্ণ পদ্ধতিতে বুঝিয়েছে যা অতুলনীয়, অসদৃশ এবং এর দলিলপ্রমাণ হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে। বিশ্বাসগত বিষয়সমূহ সবিস্তারে বর্ণনা করেছে। তিনি (আ.) বলেন, এই কুরআন এমন তত্ত্বজ্ঞানসমৃদ্ধ ও বাগ্মিতায় পূর্ণ যে, আরবের জঙ্গলের অধিবাসী যারা মূর্খ ছিল তাদের বুঝিয়েছিল। অতএব এখন এটি কীভাবে বুঝতে অক্ষম?"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২২৮)

সেসব মূর্খ লোকেরা যারা গ্রামে বাস করত তারা একেবারেই গণ্ডমূর্খ ছিল বরং সাধারণ মানুষের চেয়েও নীচে অধঃপতিত ছিল, যাদেরকে খোদা মানুষ বানিয়েছেন- তারা যদি বুঝতে পারে তবে তোমরা কেন বুঝতে পারবে না, কেননা তোমাদের অধিকাংশ তো শিক্ষিত শ্রেণীর মানুষ। তিনি (আ.) বলেন,

"সহজ, সরল ও সত্য যুক্তিবিজ্ঞান সেটিই যা পবিত্র কুরআনে আছে, এর মাঝে কোনোরূপ জটিলতা নেই। একেবারে সরল পথ যা খোদা তা'লা আমাদেরকে শিখিয়েছেন। প্রত্যেকেরই পবিত্র কুরআন গভীর অভিনিবেশসহ পাঠ করা উচিত, এর আদেশ ও নিষেধ পৃথক পৃথক দেখে রাখবে। যে বিষয়গুলো বলার, আমল করার, সেগুলো দেখবে আর যেসব বিষয় থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সেগুলোও দৃষ্টিতে রাখবে, সেগুলো পৃথক রাখবে এবং তদনুযায়ী আমল করবে। আর এর মাধ্যমে সে নিজ খোদাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে।"

খুব সহজ পদ্ধতি। যেসব বিধিবিধান আছে, বাহ্যত যেসব বিধিবিধান তোমরা দেখছ তদনুযায়ী আমল কর আর আর যা নিষেধ করা হয়েছে সেগুলো থেকে বিরত থাকো, এর দ্বারাই আল্লাহ্ তা'লা সন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। দার্শনিক এবং সূফীদের দ্বারা উদ্‌ভাবিত শব্দগুচ্ছ অধিকাংশ লোকের জন্য হোঁচট খাওয়ার কারণ হয় কেননা এগুলোর মাঝে জটিলতা থাকে।

"দার্শনিক এবং সূফীদের অনুসরণ করো না কেননা তারা এমন এমন পরিভাষা ব্যবহার করেছে এবং এমন জটিলভাবে পবিত্র কুরআনকে উপস্থাপন করেছে তদ্বারা হোঁচট খেতে হয়, কিছু বুঝা যায় না। অতএব জগতে মানুষ বিপদে পড়ে দার্শনিক এবং সূফীদের কারণে অথবা নামসর্বস্ব আলেমদের কারণে। তিনি (আ.) বলেন, এক বুযুর্গ যার বিষয়ে আমরা সুধারণা রাখি, তিনি নেক নিয়্যতে লিখে থাকবেন যদিও তার কথা ঠিক নয়। তিনি লেখেন যে, শেখ আব্দুল কাদের জিলানী পরিপূর্ণ ছিলেন না কেননা তিনি পরিপূর্ণরূপে নুযূল (তথা...) ছিলেন না বরং সঊদ (তথা...) ছিলেন। উন্নীত হওয়ার ছিল, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি তেমন কোনো ইলহাম হতো না বরং তাঁর দোয়া কবুল হতো। এ কারণে তাঁর দ্বারা অনেক অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শিত হয়েছে। যদি পরিপূর্ণ নুযূল হতো তাহলে তাঁর দ্বারা কোনো অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শিত হতো না। সেই ব্যক্তি এমনই বলেছেন। তিনি (আ.) বলেন, তার এ কথায় যতটা কুরআনী স্ববিরোধ আছে তা সুস্পষ্ট। এটি এমন কথা যা পবিত্র কুরআন এবং হাদীসের সুস্পষ্ট বিরোধী। শেখ আব্দুল কাদের জিলানী মুলত খোদা তা'লার কামেল বান্দাদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যদি তাঁর অলৌকিক নিদর্শনের বিষয়ে আপত্তি করা হয় তাহলে এই আপত্তি সমস্ত নবী -রসূলদের ওপর বর্তায়। কিন্তু একথাও স্মরণ রাখা উচিত, তার বিষয়ে অনেকে অর্থাৎ তাঁর অনুসারীদের অনেকে তাঁর অলৌকিক নিদর্শনের বিষয়ে অতিরঞ্জনও করেছে আর এ বিষয়ে টীকা লিখেছে। তাঁর বিষয়ে এগুলো ভ্রান্ত তবে হ্যাঁ, অলৌকিক নিদর্শন প্রদর্শিত হতো সেসব অলৌকিক নিদর্শন যা প্রকৃতির বিধান এবং শরিয়তের অধীনে সম্ভব তা নবী-রসূলদের দ্বারাও হয়ে থাকে, তাঁর ক্ষেত্রেও হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, এগুলো হলো ঐসকল সূফীদের ভুল পরিভাষার অনুসরনের ফল যার সত্যায়ন কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায় না। " (মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৫-৬)

যা হয় এক দল একেবারেই স্বীকার করে না অথবা যারা স্বীকার করে তারা সীমাতিরিক্ত অতিরঞ্জন করে ফেলে। অতএব যারা অস্বীকারকারী তারা সূফীদের কারণে আর যারা অনুসারী তারাও নির্বোধ লোকদের ব্যাখ্যার কারণে এরূপ করে থাকে। তাই এ বিষয়ে সদা মনোযোগী হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ সেগুলোকে শরীয়তের বিধান এবং আর প্রকৃতির বিধান আর নবী-রসূলদের অলৌকিক নিদর্শনের নিক্তিতে যাচাই করো। নবী-রসূলদের তুলনায় অধিক অলৌকিক নিদর্শন কেউ দেখাতে পারে না।

পবিত্র কুরআন সত্যিকার খোদাকে উপস্থাপন করে থাকে, এ বিষয়ে তিনি (আ.) বলেন, "খোদার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি কেননা পবিত্র কুরআন এমন খোদা উপস্থাপন করে নি যে এমন ত্রুটিযুক্ত গুণসম্পন্ন যে না তিনি আত্মার অধিপতি আর না সত্তার অধিপতি আর না-ই সেগুলোকে পরিত্রাণ দিতে পারে আর না-ই কারো তওবা কবুল করতে পারে বরং আমরা পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিতে সেই খোদার বান্দা যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা, আমাদের প্রভু, আমাদের রিযকদাতা, দয়ালু ও কৃপালু, বিচার দিবসের মালিক। এক্ষেত্রে মু'মিনদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত, কেননা তিনি আমাদেরকে এমন এক কিতাব দান করেছেন যা তাঁর সঠিক পরিচয় তুলে ধরে। এটি আল্লাহ্ তা'লার অনেক বড় একটি নেয়ামত।"

(মালফুযাত, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৯৮)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর গভীর তত্ত্বজ্ঞান আর পবিত্র কুরআনের গুণাবলী এবং মাকাম ও মর্যাদার কথা ভবিষ্যতেও বর্ণিত হবে ইনশাআল্লাহ্। এখন আমি এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এসব কথা বুঝার, মানার এবং কুরআন শরীফ পড়ার ও বুঝার সৌভাগ্য দান করুন।

কেননা এখন আমি কয়েজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব। বিশেষ করে বাংলাদেশের শহীদের কথা উল্লেখ করব আর এরপর আমি জানাযার নামাযও পড়াব। তাই আমি এখন সেই স্মৃতিচারণ করছি।যেভাবে আমরা জানি, গত শুক্রবারে বাংলাদেশে জলসা হচ্ছিল আর জলসা সময় দাঙ্গাবাজ ও সন্ত্রাসীরা আক্রমণ করে। পুলিশ এবং প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই একথা বলে আশ্বস্ত করে হয়েছিল যে, তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখবে আর কিছুই হবে না, তাই আপনারা জলসা করুন। কাজেই জলসার (কার্যক্রম) চলতে থাকে কিন্তু (বিরুদ্ধবাদী) লোকেরা এলে পুলিশ সেখানে নিরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে আর এভাবে কয়েক ঘন্টা অতিবাহিত হওয়ার পর তারা যখন ওপর থেকে নির্দেশ প্রাপ্ত হয় তখন তারা পদক্ষেপ নেয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত অনেক কিছু ঘটে গিয়েছিল। যাহোক সেই অরাজকতায় আমাদের এক ভাই প্রিয় জাহেদ হাসান সাহেবও শহীদ হয়। তিনি বাংলাদেশের আবু বকর সিদ্দীক সাহেবের পুত্র ছিলেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ ।

ন্যাশনাল আমীর, আব্দুল আউয়াল সাহেবব লিখেন, পঞ্চগড় জেলার আহমদনগরে অনুষ্ঠিত জলসা যজাহিদ হাসান সাহেব গেট ও সীমানা প্রাচীর প্রহরা দেয়ার সময় বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের ফলে ২৫ বছর বয়সে শাহাদাত বরণ করেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّاۤ اِلَیْهِ رَاجِعُوْنَ । মরহুম ২০১৯ সনে বয়আত করেছিলেন আর এর ৩ মাস পরেই ওসীয়্যতের জন্য আবেদন করেছিলেন। তার পরিবারের সদস্যরা আহলে হাদীস ফির্কার লোক ছিল। আহমদীয়াত গ্রহণের পরই শহীদ মরহুম তার পিতামাতাকে তবলীগ করতে আরম্ভ করেন যার ফলে ২০২০ সনে তার পিতামাতাও বয়আত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। বয়আত করার পর থেকেই শহীদ মরহুম নিয়মিত আমাকে পত্র লিখতেন।

তার বয়আত করে আহমদী হওয়ার যে ঘটনা তা হলো, তার এক সহপাঠী মুহাম্মদ রিফাত হাসান শিশির বগুড়া শহরের পুন্দ্রা ইউনিভারর্সিটি অফ সাইন্স এন্ড টেকনোলজিতে পড়াশোনা করতেন। তারা দুজন সাইন্স এণ্ড টেকনোলজিতে বিএসসি করছিলেন। তখন সেই আহমদী যুবক বন্ধু তাকে তবলীগ করেন আর দুই বছর তবলীগ করার পর তার কাছে যখন আহমদীয়াতের সত্যতা স্পষ্ট হয়ে যায় তখন তিনি বয়আত করে নেন। আউয়াল সাহেব লিখেন, জলসার শুরুতেই জলসা গাহের চতুর পাশ থেকে মোল্লারা তাদের দলবল নিয়ে জলসা গাহের প্রাচীর ও পশ্চিম দিকের গেটে আক্রমণ করতে থাকে। ইটপাটকেল নিক্ষেপের পাশাপাশি দেশীয় অস্ত্রশস্ত্র যেমন, কুঠার, লাঠিসোঁটা ইত্যাদি নিয়ে এসব লোক আক্রমণ চালায় এবং যেখানেই সুযোগ পায় অগ্নিসংযোগ করতে থাকে। খোদ্দাম অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালন করছিল। যারা দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল তাদের ছাড়া সাধারণভাবে অন্য কারো বাইরে যাওয়ার অনুমতি ছিল না। সবলোক ও খোদ্দাম ভেতরেই ছিল আর ভেতর থেকেই নিরাপত্তা বিধান করছিল। তিনি বলেন, জলসা শুরু হ ওয়ার পৌনে দুই ঘন্টা পর আক্রমণকারীরা দেয়ালের একাংশ ভেঙ্গে ফেলতে সক্ষম হলে খোদ্দামকে যেকোনো মূল্যে প্রাচীর ও জলসা গাহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দেয়া হয়। তখন এক নম্বর গেটে নিয়োজিত শহীদ জাহেদ হাসান তার সঙ্গীদের নিয়ে গেট থেকে বের হয়ে জলসা গাহে আক্রমণকারীদের তাড়িয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং সাহসিকতার সাথে (ঘটনাস্থলে) গিয়ে পৌঁছেন। এরই ফাঁকে একটি সময় এমন আসে যখন তিনি মুকাবিলা করতে করতে সঙ্গীদের থেকে পৃথক হয়ে যান। তাই সুযোগ পেয়ে আক্রমণকারীরা তাকে ঘিরে ধরে। তার মাথার পিছনে কুঠার অথবা অন্য কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে আর তাকে টেনেহেঁচড়ে কিছুটা দূরে নিয়ে যায়। তাঁর মুখমণ্ডল ও শরীরের বিভিন্ন অংশে অত্যন্ত নির্মম ও পৈশাচিক আক্রমণ করে পশুত্বের পরিচয় দিয়েছে।

শহীদ মরহুম জাহিদ হাসান সাহেবকে এতটা নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে যে , তাঁকে শনাক্ত করতে দুই ঘন্টা সময় লেগে যায়। এই হলো এসব মুসলমানদের অবস্থা। আল্লাহ্ এবং রসূলের নামে অত্যাচার ও বর্বরতার চূড়ান্ত করেছে। মহানবী (সা.) তো যুদ্ধের মাঝে শত্রুদের, অর্থাৎ কাফেরদের লাশ বিকৃত করতে নিষেধ করেছেন; কিন্তু এরা আল্লাহ্ এবং রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারীদের সাথে এমন আচরণ করে।

আল্লাহ্ই রয়েছেন যিনি এদের পাকড়াও করার ব্যবস্থা করবেন এবং এরপর তাদের ধ্বংস করবেন। তাঁর ডিউটির আইডেনটিটি কার্ডও হন্তারকরা ছিঁড়ে ফেলেছিল, বুক থেকে খুলে ফেলেছিল। কিন্তু তিনি যেহেতু খোদ্দামের ডিউটির কাপড় পরিহিত ছিলেন এজন্য কিছু না কিছু চেনা যাচ্ছিল। যাহোক তাঁর লাশ উদ্ধার করার পর তাহাজ্জুদ ও ফজরের নামাযের পর শহীদের জানাযার নামায আদায় করা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে জলসায় অংশগ্রহণ করা হাজার হাজার লোক এতে অংশগ্রহণ করেন। জানাযার নামাযের সময় উপস্থিত সকলের মাঝে যে অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার কোনো তুলনা হয় না। সেখানে অত্যন্ত আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। সবাই খোদার দরবারে আহাজারি করছিল। আইনী বাধ্যবাধকতা থাকার কারণে এরপর লাশের ময়নাতদন্ত করা হয় এবং দুপুরের পর কাফেলার সাথে শহীদ মরহুমের মরদেহ তাঁর পৈত্রিক গ্রামের উদ্দেশ্যে এম্বুলেন্সে করেপাঠানো হয়। সেখানে রাত দশটায় তাঁকে সমাহিত করা হয়।

শহীদ মরহুমের ঘনিষ্টতম বন্ধু স্নেহের রিফাত হাসান সাহেব বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁর সাথে বন্ধুত্ব হয়। প্রকৃতিগতভাবেই তিনি অত্যন্ত ভদ্র ছিলেন, কিন্তু ইবাদতের প্রতি আকর্ষণ কম ছিল। কিন্তু আহমদীয়াত গ্রহণ করার পর তাঁর মাঝে আমুল পরিবর্তন আসে এবং বাজামাত নামাযে অভ্যস্ত হয়ে যান। তিনি অত্যন্ত বিনয়ী, নম্র ও বিনীত একজন যুবক ছিলেন। তিনি বলেন, পাঁচ বছরের মধ্যে আমি কখনোই তাঁকে কারো সাথে উঁচু স্বরে কথা বলতে শুনি নি। তাঁর সৌভাগ্যের পরিচয় এভাবেও পাওয়া যায় যে, বয়আত করার কয়েক মাস

পরেই তিনি ওসীয়্যত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি বলেন, স্নেহের শহীদ জাহিদ হাসান খোদ্দামুল আহমদীয়ার সক্রিয় কর্মী ছিলেন। শাহাদাতের সময়ে তিনি ঢাকা ও বরিশাল রিজিওনের খোদ্দামুল আহমদীয়ার মোতামাদ হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করছিলেন। এছাড়াও তিনি ঢাকার মতিঝিল হালকার যয়ীমও ছিলেন।

এই মজলিসের কায়েদ এবং মোহতামীম মোকামী জনাব জহুরুল ইসলাম সাহেব বলেন, তিনি মজলিসের কাজে অত্যন্ত একাগ্র চিত্ত এবং নিজের সিনিয়রের অনুগত ছিলেন। অর্পিত দায়িত্ব এবং খেদমত পূর্ণ আগ্রহের সাথে পালন করতেন। সর্বদা প্রথমে সালাম দিতেন। সব সময় হাস্যোজ্জল থাকতেন। এক-দেড় বছর পূর্বে তিনি বি.এস.সি. পাশ করার পর একটি কোম্পানীতে চাকরির শুরু করেন । চাকরির সুবাদে কখনো যদি ঢাকা থেকে দূরে কোথাও যেতে হত তখন সুযোগ সুবিধা অনুযায়ী নিকটবর্তী মজলিসগুলো সফর করতেন। তাঁর ফেসবুক একাউন্টের ব্যক্তিগত প্রোফাইলে إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ- এ আয়াতের অনুবাদ লেখা রয়েছে।

শরীফ আহমদ সাহেব মুরব্বী সিলসিলা বলেন, আমি তখন তেবাড়িয়া জামা'তে নিযুক্ত ছিলাম যখন শহীদ মরহুম তঁ ার বন্ধু রিফাত হাসান সাহেবের সাথে যেরে তবলীগ বন্ধু হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি বয়আত করার আগ্রহ প্রকাশ করলে আমি তাঁকে বলি, আপনি আরো সময় নিন, ভালোভাবে যাচাই বাছাই করুন। তিনি বলেন, যদিও আমি এই জামা'তের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত তথাপি আপনার কথামত পরবর্তীতে এসে বয়আত করব। অতএব পরবর্তীবার অথবা এরপরের বার তিনি বয়আত করেন। তিনি, অর্থাৎ মুরব্বী সাহেব বলেন, বয়আত করার পর তিনি আহমদীয়াত এবং খিলাফত ব্যবস্থাকে উপলব্ধি করার জন্য পুরোদমে চেষ্টা প্রচেষ্টা করতে আরম্ভ করেন। অত্যন্ত গভীর জ্ঞান আহরণ করেন। যেভাবে আমি বলে ছি, আমাকেও পত্র লিখতেন। জলসায় যাওয়ার সময় তিনি সর্বশেষ যে পত্র লিখেন তাতে তিনি লিখেন, আমরা ট্রেনে করে জলসায় যাচ্ছি আর শত্রুদের ষড়যন্ত্র অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, অনেক স্থানে তারা অগ্নিসংযোগও করেছে কিন্তু আমরা জলসা করব ইনশাআল্লাহ্। এছাড়া তিনি তার ঈমানের কথা ব্যক্ত করেন আর এ প্রত্যাশাও ব্যক্ত করেন যে, আমার আত্মীয়স্বজন ও গ্রামের সব মানুষ যেন আহমদী হয়ে যায়, গোটা গ্রাম যেন আহমদী হয়ে যায়। এটি ছিল তার শেষ চিঠি যা তিনি লিখেছিলেন।

একজন খাদেম লিখেন, শহীদ মরহুম এমন বিনয়ী কর্মী ছিলেন যে, তাকে কেউ কোনো কাজ দিলে তিনি না করতেন না। তিনি বলেন, কখনো কখনো আমি মজা করে বলতাম, আমরা যদি এতো কাজ করি তাহলে তো আমরা শেষ হয়ে যাব। একথা শুনেও সব সময় হেসে উঠতেন। শহীদ মরহুম ওসীয়্যতকারীও ছিলেন। তিনি বলেন, (একবার) আমি তাকে জিজ্ঞেস করি, আপনার এত তাড়াতাড়ি ওসীয়্যত করার কারণ কী? উত্তরে তিনি বলেন, ইমাম মাহ্দী সত্য ছিলেন, তাই তিনি (আ.) যা কিছু বলেছেন তা সত্য। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ওসীয়্যত করতে নির্দেশ দিয়েছেন, তাই আমি ওসীয়্যত করেছি। তিনি বলেন, আমি তার কথা শুনে বিস্মিত হয়ে যাই যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তিনি কত গভীর ঈমান রাখেন! তিনি আরো বলেন, শহীদ মরহুমকে একবার তার আহমদীয়াত গ্রহণের মূল কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ইমাম মাহ্দী বা মসীহ্ অথবা নবীর দাবিদার কোনো ব্যক্তি বা জামা'তই আজ পর্যন্ত সফলতা লাভ করে নি, ব্যতিক্রম কেবল হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। তিনি (আ.)ও যদি সত্য না হতেন তাহলে তাঁর অবস্থাও অন্য দাবিদারদের মতই হতো।

শহীদের পিতামাতা উভয়েই জীবিত আর আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তারা দুজনেই আহমদী, যেভাবে পূবেই উল্লেখ করেছি। শহীদ মরহুম পিতামাতার একমাত্র ছেলে ছিলেন আর এখনো পর্যন্ত অবিবাহিত ছিলেন। তার দুজন বোন রয়েছেন আর তারা উভয়েই বিবাহিতা, কিন্তু তারা আহমদী নন তবে তাদের তবলীগ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা তার পিতামাতাকে ধৈর্য ও মনোবল দান করুন। যেভাবে আমি বলেছি, একমাত্র ছেলে ছিলেন, তাই তারা অনেক বেশি কষ্ট পেয়েছেন। কেবল আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহেই কষ্ট সহ্যের সুযোগ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ তা'লা শহীদের পদমর্যাদাও উন্নীত করুন। যাহোক এই শহীদ তো আল্লাহ্ তা'লার বাণী অনুসারে স্থায়ী জীবন লাভ করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সাথে বিশেষ আচরণ করুন এবং খুব দ্রুতই এসব যালেম দুষ্কৃতকারীকে ধৃত করার উপকরণ সৃষ্টি করুন।

শত্রুরা মনে করে জামা'তের সদস্যদেরকে এভাবে পরীক্ষায় ফেলে এবং বলপ্রয়োগ করে তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিবে। কিন্তু এটি এর পুরোপুরি উল্টো বিষয়। সেখান থেকেও কিছু পত্র আমার কাছে এসেছে। অনেক যুবক লিখেছেও যে, যদি আরো শাহাদাতের প্রয়োজন পড়ে তাহলে দোয়া করুন যাতে আমরাও তাতে অংশগ্রহণ করতে পারি।অতএব এরূপ হীন শত্রু কী ক্ষতি করতে পারে?

যাহোক আমাদের দোয়া করা উচিত আল্লাহ্ তা'লা যেন তাদের অনিষ্ট থেকে আমাদের রক্ষা করেন এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া করেন। এখন দোয়ার প্রতি অনেক বেশি জোর দিন।

পরবর্তী জানাযা যার স্মৃতিচারণ আমি করতে চাই তিনি হলেন আলজেরিয়া নিবাসী কামাল বাদা সাহেব। তিনি ০২ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৫৭ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-। জামা'তের প্রেসিডেন্ট আব্দুল আলীম সাহেব লিখেন, মরহুম একজন সত্যিকার মু'মিন এবং নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। জামা'তের সভা সমাবেশ, নামায এবং তবলীগি কর্মকাণ্ডের জন্য তিনি তার বাড়ির দরজা সর্বদা খোলা রাখতেন। সব আহমদী তার দৃঢ় ঈমান, আতিথেয়তা ও উদারতার সাক্ষ্য দেয়। মরহুম শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিন সন্তান স্মৃতিচিহ্ হিসাবে রেখে গেছেন। এদের মধ্যে দুই পুত্র অ-আহমদী আর এক কন্যা আহমদী। তার স্ত্রী শ্রদ্ধেয়া করীমা সাহেবা লাজনার সদর হিসাবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন।

আলজেরিয়া থেকে হাস্সান জামুলি সাহেব বলেন, কামাল বাদা সাহেব অত্যন্ত নিষ্ঠাবান এবং খুবই খেদমতকারী একজন আহমদী ছিলেন। প্রতিবেশির পক্ষ থেকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখিন হওয়া সত্ত্বেও শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত নিজের ঘর তিনি নামাযের জন্য উন্মুক্ত রেখেছেন। জুমুআর নামাযের জন্য আগত মেহমানদের জন্য কখনো কখনো তিনি নিজেই খাবার রান্না করতেন। জনসেবামূলক বিভিন্ন কাজে এবং রক্তদান কর্মসূচিতে অংশ নিতেন। মরহুমের ঘরে বিভিন্ন সভা-সমাবেশও হত এছাড়া ঈদের নামাযও হত। প্রশাসনের কাছে জামাতের যে প্রতিনিধি দল যেত তিনি উক্ত দলেও থাকতেন।

মরহুম বলতেন, আজকাল আলজেরিয়াতে যেসব অত্যাচার নিপিড়ন হচ্ছে; আসলে আমরা জামা'তের ইতিহাস রচনা করছি। আর এখন মরহুম নিজেও সেই ইতিহাসের অংশ হয়ে গেছেন। আল্লাহ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

পরবর্তী জানাযা বা স্মৃতিচারণ হলো ডাক্তার শামিম মালেক সাহেবার। যিনি ২০১০ সনে লাহোরে দারুয যিকর-এ শাহাদত বরণকারী জনাব মাকসুদ আহমদ মালেক সাহেবের সহধর্মিনী। তিনি তাঁর স্বামীর শাহাদত বরণের কিছুদিন পর কানাডা চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানেই তার মৃত্যু হয়। মরহুমা পিএইচডি পর্যন্ত শিক্ষার্জন করেন। কলেজে পড়াতেন প্রভাষিকা হন। বিভাগের প্রধান পর্যন্ত পদোন্নতি লাভ করেন কিন্তু এর পাশাপাশি ঘরের কাজ ও বাচ্চাদের দেখাশোনার দায়িত্বও অতি উত্তমরূপে পালন করেন। কোনরূপ পার্থক্য না করে সব শ্রেণির মানুষের সাথে উদার চিত্তে আতিথেয়তা করতেন। অভাবিদের খেয়াল রাখতেন। তিনি একজন বিচক্ষণ ও বিদুষী নারী ছিলেন। অ-আহমদীদের এবং অ-আহমদী আত্মীয়-স্বজনদেরক সর্বদা তবলীগ করতেন। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক সর্বদা অধ্যয়ন করতেন। তার জীবদ্দশাতেই পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তার ওপর একটি থিসিস লেখা হয়েছে। সাধারণত মৃত্যুর পর থিসিস লেখা হয় কিন্তু তার বিষয়ে তার জীবদ্দশাতেই লেখা হয়েছে। শিক্ষা ও অধ্যয়নের খুবই আগ্রহ ছিল। বহু লোককে তিনি পবিত্র কুরআন পড়িয়েছেন। নামায, রোযা এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের ক্ষেত্রে নিয়মিত ছিলেন। নিয়মতি তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। ইসলামী নীতি মেনে চলতেন, একজন পর্দানশীন মহিলা ছিলেন। একনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত ছিলেন। খেলাফতের সাথে বিশেষ আন্তরিক ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। মরহুমা মুসিয়াও ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে এক পুত্র এবং চার কন্যা সন্তান রেখে গেছেন। ইনি লাহোর জামা'তের আমীর মালেক তাহের সাহেবের সহোদর বোন ছিলেন। আল্লাহ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন। তার সন্তানসন্ততিকেও খেলাফত ও জামাতের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত রাখুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ জার্মানির এরশাদ আহমদ আইনী সাহেবের পুত্র স্নেহের ফরহাদ আহমদ সাহেবের। সম্প্রতি ২৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ-। মরহুম ফ্র্যাঙ্কফোর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ছিলেন। ওয়াকফে নও এর কল্যাণময় তারহীকে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি স্থানীয় খোদ্দামুল আহমদীয়া এবং রিজিওনাল পর্যায়ে খেদমত করার সুযোগ পেয়েছেন। মরহুম খুবই পুণ্যবান, উৎফুল্ল স্বভাবের, অনুগত এবং মিশুক যুবক ছিলেন। জামা'তী ও অঙ্গসংগঠনের কাজের জন্য সদা প্রস্তুত থাকতেন। মৃত্যুর একদিন পূর্বে কোন এক জামাতী অনুষ্ঠানে সারাদিন এবং পরবর্তীতে গভীর রাত পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। পরদিন সকালে মসজিদে ফজরের নামায আদায় করার পর খোদ্দামুল আহমদীয়ার একটি মিটিং এ অংশগ্রহণ করেন আর মিটিং শেষ করে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলেন, নিজ গাড়ীর কাছে পৌঁছাতেই তার শরীর খারাপ হতে লাগল। মুরুব্বি সাহেব নিজ মিশন হাউজের জানালা দিয়ে তাকে দেখেন। তিনি তার সাহায্যের জন্য ছুটে আসেন। ততক্ষণে তিনি তার গাড়িতে বসে গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু স্বাস্থ্য খুবই খারাপ হয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তাররা এটিই বলেছে যে, তখন মারাত্মক হার্ট এটাক হয়েছিলেন। তিন চার মিনিটের মধ্যে অ্যাম্বুলেন্সও চলে এসেছিল। তারা প্রাথমিক চিকিৎসাও শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা প্রায় ৪৫ মিনিট চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খোদা তা'লার তকদীর প্রাধান্য পায় এবং তিনি স্বীয় প্রকৃত স্রষ্টার সাথে গিয়ে মিলিত হন। স্নেহের ফরহাদ পিতামাতার একমাত্র সন্তান ছিলেন। আল্ল াহ তা'লা তার পিতা মাতাকেও ধৈর্য্য ও সহনশীলতা প্রদান করুন এবং তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন, পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ চৌধুরী জাভেদ আহমদ বিসমিল সাহেবের যিনি বর্তমানে কানাডায় বসবাস করছিলেন। ৭২বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

(এরপর ৯ পাতায়.....)

ফিকাহ সংক্রান্ত মসলা মাসায়েলের উত্তর- হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণীর আলোকে।

যে ব্যক্তি জগতের জন্য কল্যাণময় তাকে দীর্ঘায়ু করা হয়

" খোদা তা'লা বলেছেন, مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ (রা'দ: ১৮) বাস্তব এটাই, যখন কোন ব্যক্তি জগতের জন্য হিত সাধনকারী তখন তার আয়ুকে দীর্ঘ করা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, রসুলে আকরম (সাঃ) স্বল্প আয়ুর ছিলেন, এই আপত্তি সঠিক নয়। প্রথমতঃ আঁ হযরত (সাঃ) মানুষের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য অর্জন করেছেন। তিনি (সাঃ) পৃথিবীতে সেই সময় আগমণ করেছেন যখন স্বভাতই পৃথিবীর একজন সংস্কারকের প্রয়োজন ছিল। আর তিনি সেই সময় প্রস্থান করেন যখন তার নবুয়তের দ্বারা পূর্ণ সফলতা অর্জন করেছেন।

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ (আল মায়েদা:৪) এই ধ্বনি অন্য কোন ব্যক্তির উদ্দেশ্য দেওয়া হয়নি আর اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا এর পূর্ণ সফলতার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছেন। যে অবস্থায় রসুলে আকরম (সাঃ) সফলতা পূর্বক প্রস্থান করেছেন, সেখানেও এমন কথা বলা চরম ভুল হবে যে তার আয়ু স্বল্প ছিল। এছাড়াও আঁ হযরত (সাঃ) এর কল্যাণরাজি চিরন্তন, প্রত্যেক যুগে তার কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত রয়েছে। এই কারণে তাঁকে জীবিত নবী বলা হয়। এবং তিনি প্রকৃত জীবনের অধিকারী। দীর্ঘায়ু হওয়ার উদ্দেশ্য অর্জিত হয়েছে। এবং এই আয়াত অনুযায়ী তিনি চিরঞ্জীব"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২৩)

হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" এই যে আপত্তি করা হয়ে থাকে যে, কিছু ইসলাম বিরোধীরাও দীর্ঘজীবি হয়ে থাকে, এর কারণ কী?

আমার নিকট এর কারণ হল, তাদের অস্তিত্বও কোনও ভাবে হিতকর হয়ে থাকে। আবু জেহল বদরের যুদ্ধ পর্যন্ত জীবিত ছিল। প্রকৃত বিষয় হল, যদি বিরোধীরা আপত্তি না করত তবে কুরান শরীফের ত্রিশ পারা কোথা থেকে আসত। যার অস্তিত্বকে আল্লাহ তা'লা হিতকর জ্ঞান করেন তাকে সময় দেন। আমাদের বিরোধীদের মধ্যে যারা জীবিত আছেন, তারা বিরোধীতা করে। তাদের অস্তিত্বের কারণেও উপকার হয় । তাদের কারণে আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করেন। যদি মেহের আলি শাহ এত চেঁচামেচি না করত তবে নুযুলে মসীহ কিভাবে লেখা হত।

অনুরূপভাবে, সেই কারণেই অন্যান্য সমস্ত ধর্ম অবশিষ্ট রয়েছে যাতে ইসলামি নীতির সৌন্দর্য্য ও গুণাবলী যাতে উন্মোচিত হয়। এখন লক্ষ্য করুন, নিয়োগ ও কাফ্ফারা ধর্মবিশ্বাস বিশিষ্ট ধর্ম যদি বিদ্যমান না থাকত তবে ইসলামী সৌন্দর্য্যের পার্থক্য কিভাবে করা যেত। মোট কথা, বিরোধীর অস্তিত্ব যদি হিতকর হয় তবে আল্লাহ তাকে সময় দেন। "

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২২৩)

রসুলে মাকবুল (সাঃ) এর সাক্ষাৎ বা দর্শন প্রসঙ্গে

(৯ই আগস্ট, ১৯০২, সন্ধ্যা বেলা) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) মগরিবের পর প্রতিদিনের মত বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর কপুরথলা থেকে আগত দুই তিন জন ব্যক্তি বয়াত করেন। বয়াতের পর এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয় যে, ইনি ক্বারী। তিনি (আঃ) বললেন কিছু অংশ পড়ে শোনাও। তিনি হযরত মসীহ মওুদ (আঃ) এর নির্দেশ মত সুরা মরীয়মের এক রুকু অত্যন্ত সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করে শোনান। এর পর হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) ক্বারী সাহেবকে অন্যান্য বিষয়বলী জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকেন। এর পর ক্বারী সাহেব নিবেদন করেন যে,দীর্ঘকাল যাবৎ আমি রসুলে আকরম (সাঃ) এর সাক্ষাৎলাভের জন্য উদগ্রীব রয়েছি। অতএব আপনি আমাকে এমন দৈনিক ইবাদতের বিষয় বলে দিন যার কল্যাণে আমি তাঁকে একটি বারের জন্য দেখতে পারি। এর উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) বলেন,

" আপনি আমার বয়াত করেছেন। যে ব্যক্তি বয়াতের অন্তর্ভূক্ত হয় তার ঐসকল উদ্দেশ্যাবলীকে দৃষ্টিপটে রাখা জরুরী যেগুলি বয়াতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। রসুলে আকরম (সাঃ) এর সাথে সাক্ষাৎলাভ হবে কি না এটি প্রকৃত উদ্দেশ্য বহির্ভুত বিষয়। এটি মোটেই মানুষের প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নয়। কুরান শরীফেও এটিকে প্রকৃত উদ্দেশ্য হিসেবে রাখা হয় নি। বরং বলা হয়েছে, اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (আলে ইমরান: ৩২) প্রকৃত উদ্দেশ্য হল রসুলুল্লাহ (সাঃ) এর আনুগত্য করা। মানুষ যখন তাঁর আনুগত্যে বিলীন হয়ে যায়, তখন সাক্ষাৎ বা যিয়ারত লাভের সৌভাগ্যও লাভ হয়। যেরূপ কোন অতিথিসেবক কাউকে নিমন্ত্রণ করলে তার জন্য উৎকৃষ্ট মানের আহার নিয়ে আসে, কিন্তু আহারের সঙ্গে একটি দস্তরখানাও নিয়ে আসে। হাতও ধোয়ানো হয়। যদিও আহার করানোই প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি রসুলে আকরম (সাঃ) এর সাথে প্রকৃত আনুগত্যের সম্পর্ক রাখে এবং সেটিকে তার উদ্দেশ্য বলে গণ্য করে, তার সাথে যে কোন সময় সাক্ষাৎ লাভ হওয়াও সম্ভব। অনেকে এখানে যারা বয়াত করতে আসেন, তারাও আমার সাথে সাক্ষাৎ করে। কিন্তু তাদের মধ্যে যে পরিবর্তন সাধিত হওয়া আমার মূল উদ্দেশ্য এবং যে উদ্দেশ্যে আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে সেটি যদি পূর্ণ না হয় তবে আমার সাক্ষাৎ তাদের কোন উপকারে আসল? অনুরূপভাবে খোদার নিকট সেই ব্যক্তি বড়ই হতভাগা এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে তার কোন মূল্য নাই যার হৃদয়ে সেই প্রকৃত নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা এবং খোদার তা'লার উপর সত্য ঈমান ও তাকওয়া নাই, যদিও সে সকল আম্বিয়ার সাক্ষাৎ-দর্শনও করে থাকে। অতএব স্মরণ রাখ! কেবল সাক্ষাৎ বা দর্শন দ্বারা কোন উপকার সাধন হয় না। খোদা তা'লা যে প্রথম দোয়া শিখিয়েছেন,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ যদি এখানে আল্লাহ তা'লার প্রকৃত উদ্দেশ্য সাক্ষাৎ বা দর্শন হত তবে তিনি 'ইহদেনা'এর পরিবর্তে اَرِنَا صُوَرَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ দোয়া শেখাতেন, যেটা তিনি করেন নি।

রসুলুল্লাহ (সাঃ) ব্যবহারিক বা বাস্তব জীবনে লক্ষ্য করুন, তিনি কখনো এমন ইচ্ছা প্রকাশ করেন নি যে ইব্রাহিম (আঃ) এর সাক্ষাৎ বা দর্শন হোক। যদিও তিনি মেরাজের সময় সকলের দর্শন লাভ করেছিলেন। এই বিষয়টি যেন উদ্দিষ্ট্য না হয়ে দাঁড়ায়। সতিকারের আনুগত্যই হল প্রকৃত উদ্দেশ্য ।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৮)

ঘুষের পরিভাষা

(৯ই আগস্ট, ১৯০২, এর সন্ধ্যাকাল) হযরত মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেব নিবেদন করেন, হুযুর ! লোকেরা একটি প্রশ্ন প্রায়ই করে থাকেন, অনেক সময় এমন হয়ে থাকে যে, কোন অধিকর্তাকে যতক্ষণ পর্যন্ত না কিছু দেওয়া না হয় তাদের কাজ সম্পন্ন হয় না। এর উত্তরে হুযুর (আঃ) বলেন,

আমার মতে ঘুষের সংজ্ঞা হল, কারোর অধিকার খর্ব করার উদ্দেশ্যে অথবা অবৈধ উপায়ে সরকারের অধিকার গোপন করতে বা তা অর্জন করতে কোন বিলাসী ব্যক্তিকে কিছু দেওয়া। কিন্তু যদি এমন পরিস্থিতি হয় যেখানে অন্য কারোর কোন ক্ষতি সাধন না হয় অথবা অপরের কোন অধিকার না থাকে, কেবল নিজের অধিকার রক্ষার্থে কিছু দিয়ে দেওয়া হয় তবে সেখানে কোন অসুবিধা নাই, আর এটি ঘুষ নয় বরং এর উপমা হল- আমরা চলতি পথে সামনে কুকুর এসে পড়লে তাকে এক টুকরো রুটি দিয়ে নিজের পথ চলতে থাকলাম এবং তার অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত থাকলাম।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৩৯)

ঘুষ মোটেই দেওয়া উচিত নয়, এটি মহা পাপ। তথাপি আমি ঘুষের পরিভাষা নির্ধারণ করছি- যার দ্বারা সরকারের অথবা অন্য কারোর অধিকার হরণ হয়, আমি তার থেকে বিরত থাকতে কঠোর নির্দেশ দিচ্ছি। কিন্তু উপহার ও উপঢৌকন স্বরূপ যদি কাউকে কিছু দেওয়া হয় যার নেপথ্যে কারোর অধিকার হরণ করার উদ্দেশ্য থাকে না বরং কেবল নিজের অধিকার খর্ব হওয়া এবং অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া উদ্দিষ্ট্য থাকে, সেখানে আমার পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। আর আমি একে ঘুষ বলব না। কারোর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাওয়া থেকে শরিয়ত নিষেধ করে না। বরং বলা হয়েছে لَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

(আল বাকারা: ১৯৬)

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৪৩)

****

জামেয়াতে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া কাম্য

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) বলেন:

" জামেয়া আহমদীয়ায় ভর্ত্তি হওয়া ছাত্রদের মধ্যে ওয়াকফে নওদের সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয়। ..... আমাদের সামনে সমগ্র বিশ্বের ময়দান রয়েছে। এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, দ্বীপপুঞ্জ-মোটকথা সর্বত্র আমাদেরকে পৌঁছাতে হবে। প্রতিটি স্থান, প্রতিটি মহাদেশ, দেশ আর শহরে নয়, আমাদেরকে প্রতিটি গ্রামে-গঞ্জে ইসলামের অনিন্দ সুন্দর বাণী পৌঁছে দিতে হবে। কয়েকজন মুবাল্লিগ এই কাজ সমাধা করতে পারে না।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ১৮ই জানুয়ারী, ২০১৮)

(ইনচার্জ, ওয়াকফে নও বিভাগ, ভারত)

সফরে এবং অসুস্থতায় রোযা পালন সম্পর্কিত নির্দেশনা

সংকলন: রইস আহমদ, মুরুব্বী সিলসিলা।

ইসলাম ধর্ম হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং এর সমস্ত বিধি বিধান পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের ফিতরত এবং চরিত্রের দিকে দৃষ্টি রেখে সন্নিবেশিতি রেখে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বর্ণনা করেছেন। আর যার ব্যাখ্যা আঁ হযরত (সা.)-এর বর্ণনাতে পাওয়া যায় আর অপর দিকে তিনি (সা.) তাঁর সুন্নত দ্বারা সেই বিধি বিধানের উপর আমল করে দেখিয়েছেন। আঁ হযরত (সা.) -এর পূর্ণাঙ্গ যিল্ল হযরত হযরত মসীহ মওউদ (আ.) নিজের বর্ণনা এবং নিজের জীবনে আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নতের উপর আমল করে আমাদের সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

রোযা সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)-এর সমস্ত নির্দেশ হাদীসে আছে। যার উপর তিনি (সা.) আমল করেছেন এবং করিয়েছেন। কিন্তু আশ্চর্য হলেও সত্য যে, সাধারণ মানুষ এই বিধি-বিধান ছেড়ে দিয়ে নিজেদের উপর এমন বোঝা নিয়েছে যেটা কুরআন ও হাদীসে বিরোধী। যার মধ্যে আছে সফরে অথবা অসুস্থ অবস্থায় রোযা রাখা, সাবালক হওয়ার আগে শিশুদের রোযা রাখানো, গর্ভবতী ও স্তনদানকারী মহিলাদের রোযা রাখা এর অন্তর্ভূক্ত। আশ্চর্যজনক কথা অধিকাংশ আলেমধারী লোক সাধারণ মানুষকে শুধু এই জন্য এই ধারণা থেকে বাধা দেন না যে কোথাও যেন তাদের সম্মান হানি না হয়। বিশেষ করে গয়ের আহমদীদের মধ্যে বংশ পরম্পরায় ইসলামের শিক্ষার বিরুদ্ধে এই প্রথা জারি আছে। আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিত যে, হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী মসীহ মাহদী মাওউদ (আ.) ন্যায় বিচারক ও মিমাংসারী হয়ে এসেছেন এবং তিনি এই সমস্ত অ-স্বভাবজাত ও অপ্রয়োজনীয় বোঝা থেকে মানবজাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। রোযার আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

'আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য সহজ চান আর তোমাদেরকে কষ্টে ফেলতে চান না।'

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল এই যে, রোযা সম্পূর্ণভাবে রহমত, মুসলমানরা অজ্ঞানতা এবং নির্বুদ্ধিতার কারণে একে কষ্টদায়ক বানিয়ে ফেলেছে। কিছু লোক তো এই সম্বন্ধে এত শিথীলতা করেছে যে, তাদের রমযানে কোন পরোয়া নেই। পবিত্র রমযান মাস আসে আর তার ফযল ও রহমত বর্ষণ করে চলে যায়। কিন্তু তাদের খবর পর্যন্ত থাকে না যে, রমযান এল এবং চলে গেল। আর কিছু লোক এর মধ্যে কট্টরতা অবলম্বন করে। সমস্ত রোযাকে তারা ইসলাম মনে করে। আর সমস্ত অসুস্থ, দুর্বল, বৃদ্ধ, গর্ভবতী, স্তনদানকারী এবং শিক্ষার্থীর জন্যও তারা বিশ্বাস রাখে যে, তারা যেন অবশ্যই রোযা রাখে। যদিও অসুস্থতা বেড়ে যায় অথবা স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

ইসলাম হল ফিতরতের ধর্ম। কখনই এর উদ্দেশ্য এই নয় যে, মানুষকে তার সফলতার পথ থেকে সরিয়ে দিবে। এর কারণ এটাই যে, ইসলাম নিজের কিছু বিধি-বিধানের এমন কিছু শর্ত নির্ধারণ করে দিয়েছে যে, যদি এই শর্ত কারো মধ্যে পাওয়া যায় তবে যেন এই হুকুমের উপর আমল করে আর যদি না পাওয়া যায় তবে যেন না করে। যেমন হজ্জ, যাকাত ইত্যাদির বিধি বিধান। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

'আর যে অসুস্থ অথবা মুসাফির হয় তা হলে সে যেন অন্য দিন গণনা পূর্ণ করে। আর আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের জন্য সহজ চান কঠিন চান না। '

(আল-বাকারা: ১৮৬)

অসুস্থ এবং মুসাফিরদের রোযা রাখার বিধি বিধান সম্বন্ধে এই যুগের হাকামান আদালান সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

যে ব্যক্তি অসুস্থ এবং মুসাফির অবস্থায় রোযা রাখে সে খোদা তা'লার স্পষ্ট হুকুমের অস্বীকার করে। খোদা তা'লা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন অসুস্থ এবং মুসাফির যেন রোযা না রাখে। অসুস্থ সুস্থ হলে, মুসাফির সফর শেষ হলে রোযা রাখবে। খোদার এই হুকুমের উপর করা উচিত কেননা নাজাত ফযলের ফলে হয়। নিজের আমলের জোর দেখিয়ে কেউ নাজাত পেতে পারে না। খোদা তা'লা এটা বলেন নি যে, অসুস্থতা ছোট অথবা বড় আর সফর ছোট বা বড় বরং হুকুম সাধারণ ভাবে দেওয়া হয়েছে। আর এর উপর আমল করা উচিত। অসুস্থ এবং মুসাফির যদি রোযা রাখে তাহলে তার উপর আদেশ ভঙ্গের ফতওয়া অব্যশ্যই লাগবে। (বদর, ১৭ই অক্টোবর, ১৯০৭, ফিকাহ আহমদীয়া-২৯০)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন:

" রমযান মাসে সফর করা অবস্থায় রোযা রাখা সম্পর্কে প্রকৃত পক্ষে আপনারা যদি গভীরভাবে চিন্তা করেন তবে দেখবেন এতে নেকী নেই। কেননা মানুষ রমযান মাসে সকলে মিলে রোযা রাখে আর যদি রমযানের পরে রোযা আলাদাভাবে রাখতে হয় তবে বুঝা যায় যে, কঠিন কাজ ছিল। কিছু লোক নেকীর বাহানায় সহজ চায়। আর বলে যে, রোযাকে টালবাহানা করে যতগুলো চলে যায় যাক তা না হলে পরে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হবে। তো যাই হোক আল্লাহ্ অন্তর্যামী, তাঁকে ধোঁকা দেওয়া সম্ভব নয়।"

হুযুর (রহ.) আরও বলেন:

আপনি পুনরায় বিশ্লেষণ করে দেখলে জানতে পারবেন যে, অধিকাংশ সফরে রোযা পালনকারী এই জন্য রোযা রাখে যে, এখন রমযান মাস চলছে সবাই রোযা রাখছে আমিও রেখে নিই। পরে আর কে রাখবে?

কিছু পিতা মাতা তাদের ছোট ছোট বাচ্চাদের রোযা রাখতে বলেন আর পরে তারা গর্ব করে বলেন যে, আমার বাচ্চা এতগুলো রোযা রেখেছে, তাদের রোযা রাখানোর উদ্দেশ্য এটাই যে, পরে তারা যেন ফলাও করে বলে বেড়াতে পারে। আসলে এটা বাচ্চাদের উপর যুলুম করা এবং রোযা থেকে তাকে বিতশ্রদ্ধ করে তোলার নামান্তর।

স্তনদানকারী এবং গর্ভবতীর সম্বন্ধে আঁ হযরত (সা.)-এর বাণী আছে। তিনি বলেন- আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে রোযা থেকে অব্যহতি দিয়েছেন। হযরত মুসলেহ মওউদ (আ.) বলেন:

বৃদ্ধ যার শক্তি শেষ হয়ে গেছে আর রোযা তাকে জীবনের বাকী কাজ থেকে বঞ্চিত রাখে তার জন্য রোযা রাখা নেকী নয়। তারপর সেই শিশু যার শক্তি অর্জনের অধ্যায় চলছে আর সামনে ৫০/৬০ বছরের জন্য শক্তি সঞ্চয় করছে তার জন্য রোযা রাখা নেকী হতে পারে না। কিন্তু যার মধ্যে শক্তি আছে আর সে রমযান পায় সে যদি রোযা না রাখে তবে সগুনাহর ভাগীদার হবে।

(আল-ফযল, ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৯২৫, ফিকাহ আমহদীয়া-২৯১)

খুতবার শেষাংশ.....

বিগত দীর্ঘদিন যাবত তিনি অসুস্থ ছিলেন। তিনি তাহরীকে জাদীদের জমির ম্যানেজার হিসাবে দীর্ঘ সময় অর্থাৎ ২০-২৫ বছর কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। এছাড়াও খোদ্দামুল আহমদীয়া ও জামাতের অন্যান্য দায়িত্বেও সেবা প্রদানের সুযোগ পান। উমরকোর্ট জেলার আমীর হিসেবে কাজ করার তৌফিক লাভ করেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী এবং চার পুত্র এবং দুই কন্যা রেখে গেছেন।

তার পুত্র তাহের আহমদ সাহেব বলেন, আমার পিতা অনেক গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। ধর্মরসেবক ও জনহিতৈষী ছিলেন, খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালবাসা ছিল এবং সর্বদা খিলাফতের সাথে এক বিশেষ সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রয়াশি থাকতেন। দরিদ্রদের প্রতি যত্নশীল ছিলেন। তিনি জমিদার ছিলেন এবং সিন্ধে তার জমি ছিল, যখনই তিনি এখান থেকে যেতেন, দরিদ্র কৃষকদের জন্য উপহারসামগ্রী এবং কাপড়চোপড় ইত্যাদি নিয়ে যেতেন যেন তাদের বিয়ে শাদীতে কাজে লাগে। তিনি বলেন, তিনি অনেক অতিথিপরায়ণ ছিলেন। প্রতিনিয়ত আমাদের ঘরে অতিথি থাকত এবং অত্যন্ত স রলতার সাথে তাদের আপ্যায়ন করতেন। আল্লাহ তা'লা তাকে অনেক সাহসীও বানিয়েছিলেন। যখনই বিরোধীদের মুখোমুখি হতে হয়েছে সর্বদা জামাতের প্রতি আত্মাভিমানকে প্রাধান্য দিতেন। আদালতের অনেক বিষয়ে অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে জামাতের অনুসরণ করেছেন। একারণে বিরোধীরা দু'বার তার ওপর আক্রমণও করেছে কিন্তু আল্লাহ তা'লা সে সময় তাকে রক্ষা করেছেন। খুবই নিরলস পরিশ্রম করেছেন এবং সর্বদা জামাতের অর্থের খুবই মূল্যায়ন করতেন। আল্লাহ তা'লার প্রতি খুবই আস্থাশীল ছিলেন। সাদাসিদে জীবনযাপন করতেন এবং তার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল, তার শেষ অসুস্থতা অনেক দীর্ঘ সময়ব্যপি ছিল, কিন্তু অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে তা সহ্য করেছেন এবং আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট ছিলেন। তার মৃত্যুর একদিন পূর্বে তার চিকিৎসক বলেন, আমি এত ধৈর্য্যশীল মানুষ জীবনে কখনো দেখি নি, কখনও কোন অভিযোগ করেননি। যখন তাকে বলা হয়, ডাক্তার আশা ছেড়ে দিয়েছেন। তখনো কিছুটা চেতনা ছিল, কথা বলতে পারতেন না, শুনতেন– পরম প্রশান্তির সাথে তা শুনেন এবং সিদ্ধান্ত মেনে নেন। তার ছেলে বলে, তাহাজ্জুদ পড়া ও তসবীহ পড়ার খুবই আগ্রহ ছিল। সবসময় সর্বাগ্রে যুগ-খলীফার জন্য দোয়া করতেন। আমাদেরকেও দোয়া করার জন্য উপদেশ দিতেন। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ছিলেন, অনেক কৃতজ্ঞ বান্দা ছিলেন। কঠিন ও দুরূহ পরিস্থিতিও হাসিমুখে সহ্য করে নিতেন। অত্যন্ত স্বচ্ছ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। এরপর তার পুত্র লেখেন, তিনি আমাদের সর্বোত্তম শিক্ষকও ছিলেন, স্নেহশীল পিতাও ছিলেন, সকল আকাঙ্খা পূর্ণকারী এবং উত্তম পরামর্শদাতা পিতা ছিলেন। খুবই দৃঢ় মানসিকতার অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'লার কৃপায় তার সন্তানসন্ততিও জামাতের সাথে উত্তমভাবে সম্পৃক্ত। আমার সাথেও তার পুরোনো সম্পর্ক ছিল। তার পুত্র যেসব গুণাবলী বর্ণনা করেছে তা অন্যান্য লোকেরাও লিখেছে কিন্তু আমিও দেখেছি, তিনি প্রকৃতপক্ষেই এ সমস্ত গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। আল্লাহ তা'লা তার সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন।

মহানবী (সা.)-এর বাণী

কোন জিনিসে যত নম্রতা ও কোমলতা থাকে, সেই বস্তুর জন্য তত বেশি সৌন্দর্যের কারণ হয় আর যেটি থেকে কোমলতা ও নম্রতা হারিয়ে যায়, সেটি ততটাই কুৎসিত হয়ে পড়ে।" (সহী মুসলিম)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত না এক মহান সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা শান্তিদাতা- এই বিশ্বাস কেবল ইসলাম আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে।

'হে ইউরোপ! তুমিও নিরাপদ নও। হে দ্বীপবাসী! কোনও কল্পিত খোদা তোমাদের সাহায্য করবে না। আমি শহরগুলিকে ধ্বংস হতে দেখছি এবং জনপদগুলিকে জনমানবশূন্য দেখছি।" [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)]

এমতাবস্থায় যদি কোনও আশার কিরণ এবং শান্তির নিশ্চয়তা থাকে তবে তা একমাত্র সত্তা যাকে আল্লাহ্ তা'লা শান্তি ও নিরাপত্তার শিক্ষাসহকারে পৃথিবীতে প্রেরণ করেছিলেন, যিনি হলেন শান্তির রাজপুত্র, যিনি আল্লাহ্ তা'লার নিকট সমস্ত মানুষের থেকে বেশি প্রিয়। যার উপর আল্লাহ্ তা'লা শেষ পরিপূর্ণ শরিয়ত অবতীর্ণ করেছেন।

প্রকৃত শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন ব্যক্তিগত,বংশগত,জাতিগত অগ্রাধিকারের উর্দ্ধে এসে মানুষ একথা উপলব্ধি করবে যে, আমার উপর অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ সত্তা রয়েছেন যিনি কেবল আমার জন্যই শান্তি চান না, বরং সমগ্র পৃথিবীর জন্য শান্তি চান।

জলসা সালানা জার্মানী (২০২২) উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সমাপনী ভাষণ।

(প্রদত্ত ২১ শে আগস্ট, ২০২২, স্থান- আইওয়ানে মসরূর, ইসলামাবাদ, টিলফোর্ড)

হুযুর আনোয়ার বলেন: নিজেদের ইহকালও রক্ষা করে এবং পরকালও রক্ষা করে। এমন পূর্ণাঙ্গীন শিক্ষা দান করেছেন যার মোকাবালা অন্য কোনও শিক্ষা করতে পারে না। তিনি এমন শান্তির নিশ্চয়তা দান করেছেন যা বস্তুত আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকেও দেওয়া নিশ্চয়তা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মুসলমানেরাও এই শিক্ষা ভুলে গিয়েছে এবং ঈমানের মৌখিক দাবি উচ্চকিত করে একে অপরের রক্তপিপাসু হয়ে উঠেছে। আর এর জন্য অপরের সাহায্যও নিচ্ছে।

একজন কলেমাধারী মুসলমান অপর এক কলেমাধারী মুসলমানকে বিরুদ্ধবাদীদের সাহায্য নিয়ে হত্যা করছে। মুসলমানদের জন্য এর থেকে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে পারে? এমন অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা এবং সমব্যথী রসুলের আনুগত্যের দাবি করা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তা'লার বিরাগভাজন হচ্ছে। আর পৃথিবীতে শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রচারের পরিবর্তে অশান্তি ও অরাজকতা ছড়ানোর জন্য কুখ্যাতি অর্জন করে চলেছে। আর এই সব কিছু এই কারণে যে, এরা আল্লাহ্ তা'লার কথা কানে তোলে না, যিনি এই যুগে শান্তি ও সৌহার্দের সম্রাট এবং আল্লাহর সর্বাধিক প্রিয়ভাজন নবী (সা.)-এর প্রাণদাসকে পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতির প্রচারের জন্য প্রেরণ করেছেন। শুধু তাই নয়, এরা এতটা সীমাতিক্রম করেছে যে, তাঁকে এবং তাঁর অনুসারীদের উপর এরা 'কুফর' -এর ফতোয়া প্রদান এবং তাদেরকে হত্যা করাকে ইসলামের সেবা এবং খাতামুল আম্বিয়া হযরত মহম্মদ (সা.) প্রতি ভালবাসার মাপকাঠি বলে মনে করে। আহমদীদের জীবন নিয়ে খেলা তাদের জন্য পুণ্যের কাজ। এই সব লোকেরা কিভাবে ইসলামের শান্তির শিক্ষা পৃথিবীতে ছড়াতে পারে? যদি এরা বিবেক করত আর তাদের উলেমাগণ মন্দ উলেমা হওয়ার পরিবর্তে জ্ঞান- বুদ্ধির প্রচারক উলেমা হত যাতে এক জাতিসত্তা হয়ে হযরত মহম্মদ (সা.)-এর শিক্ষাকে পৃথিবীতে প্রসারকারী হত আর আঁ হযরত (সা.) -এর একনিষ্ঠ প্রাণদাস এর সঙ্গে মিলে পৃথিবীকে পৃথিবীর কাছে শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী পৌঁছে দিত!

যাইহোক এটা একটি ভিন্ন এবং বিস্তারিত বিষয়।

এখন আমি আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা এবং তাঁর উপর অবতীর্ণ শরিয়ত বিধান, তাঁর শান্তি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ বাণীর আলোকে বিশ্বশান্তি প্রসঙ্গে কিছু কথা আলোচনা করব।

আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা এবং তাঁর আদর্শের ব্যপকতা এতটাই বিশাল যে, এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে তা আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। যাইহোক, যেমনটি আমি বলেছি, কয়েকটি কথা আমি বলব।

আহমদীয়া জামাত সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে যে, (নাউযুবিল্লাহ্) আমরা নাকি আঁ হযরত (সা.)-এর অবমাননা করি আর এবং এমনটি করার শিক্ষা দিই। কিন্তু বস্তুত আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা অনুশীলনকারী এবং তাঁর অনুরাগী জামাত। জামাতের বই-পুস্তক এর সাক্ষী। প্রতি বছর হাজার হাজার সৌভাগ্যবান মানুষ এই শিক্ষা ও ভালবাসা প্রত্যক্ষ করে আহমদীয়া জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়। অ-আহমদীরাও একথা বলতে বাধ্য হয় যে, ইসলামের এই শিক্ষা এমন প্রভাবপূর্ণ এবং ভালবাসা ও সম্প্রীতির শিক্ষাদানকারী যে এটিই পৃথিবীর শান্তির একমাত্র সমাধান।

সম্প্রতি আমি যুক্তরাজ্যের জলসায় জামাতের উন্নতির রিপোর্টে এবং জলসা সম্পর্কে মানুষের প্রতিক্রিয়ার বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে দেখিয়েছিলাম যে, কিভাবে তারা আহমদী পরিবেশ এবং জলসার পরিবেশে প্রভাবিত হয়েছে এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে অবগত হয়েছে। যাইহোক, আমাদের বিরুদ্ধবাদীরা যা কিছু মনে করুক বা তার যা খুশি করুক- যদি আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি আমাদের ভালবাসা থাকে, তাহলে আমাদের কাজ হল আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা অবলম্বন করা এবং তা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া এবং পৃথিবীকে জানিয়ে দেওয়া যে, আজ পৃথিবীর শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষার এটিই একমাত্র সমাধান। অতএব, এস এবং শান্তি ও সম্প্রীতির দানকারী এই মহান সত্তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে ইহকাল ও পরকালে নিজেদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত কর। এগুলি শুধু কথার কথা নয়। আমরা ইতিহাসে চোখ দিলে দেখতে পাই যে, কিভাবে এই নবী অশিক্ষিত এবং অজ্ঞ আরব জাতিকে অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে বের করে তাদেরকে উচ্চনৈতিকতা সম্পন্ন মানুষে পরিণত করেছে এবং জ্ঞান ও পারদর্শিতার সুউচ্চ মিনারে পৌঁছে দিয়েছেন। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'তিনিই সেই রসুল যিনি পশুসুলভ মানুষদের মানুষে পরিণত করেছেন এবং মানুষ থেকে সভ্য মানুষে পরিণত করেছেন। অর্থাৎ সত্যিকার নৈতিকতার ভারসাম্য স্থাপন করেছেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে সভ্য মানুষ থেকে খোদাপ্রেমী মানুষ হওয়ার উপযোগী ঐশী রঙে রঙীন করেছেন।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ২য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩)

সুতরাং তিনি (সা.) তাঁর অনুসারী এবং অনুরাগীদেরকে নৈতিকতা এবং ইবাদতের পদ্ধতি শিখিয়েছেন। যারা সেটিকে খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যমে পরিণত করেছে এবং তাদের প্রতিটি কথা ও কাজ খোদার সন্তুষ্টি লাভের জন্য হয়ে গেছে। সৃষ্টির অধিকার প্রদান করেছেন সেটাও খোদার নৈকট্য লাভের জন্য। অতএব, আঁ হযরত (সা.) এর প্রকৃত অনুবর্তিতা মানুষকে এই মর্যাদায় উপনীত করে যেখানে সে আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃত প্রেমী হয়ে ওঠে। আর এই প্রকৃত ভালবাসা মানুষের প্রতিটি কাজ ও কর্মকে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারীতে পরিণত করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.) সত্যিকার অনুবর্তিতাকারীদের সম্পর্কে বলেন-

'সত্য অন্তঃকরণে আঁ হযরত (সা.)-এর অনুবর্তিতা এবং তাঁর প্রতি ভালবাসা অবশেষে মানুষকে খোদার নৈকট্যভাজন বানিয়ে দেয়।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৬৭)

অতএব, আঁ হযরত (সা.) মানুষের হৃদয়ে যে বিপ্লব আনয়ন করেছিলেন তার প্রভাবে মুশরিকরা একেশ্বরবাদীতে পরিণত হয় আর তারা এমন একেশ্বরবাদী যে, খোদার প্রিয় ভাজন হয়ে ওঠেন। তারা খোদা প্রেমী হয়ে ওঠেন। এই খোদাপ্রেমীরা যথাযথভাবে ইবাদত করেছেন । আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত শিক্ষা যথাযথভাবে অনুশীলন করেছেন এবং এর মান স্থাপন করেছেন।

মানুষ যখন কাউকে ভালবাসে তখন তার প্রতিটি কথা ও কাজকে নিজের মধ্যে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করে, তার প্রতিটি কথা শোনার এবং মেনে চলার চেষ্টা করে। কেবল মৌখিক ভালবাসার দাবি করে না।

তাই এই সব মানুষের মধ্যে যখন খোদার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হল তখন তারা খোদা তা'লার সৃষ্টির অধিকার প্রদানের প্রতি মনোযোগী হল। হুকুকুল ইবাদ অর্থাৎ বান্দাদের অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রেও একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকল। আর যখন এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তখন পারস্পরিক ভালবাসাও সৃষ্টি হয় আল্লাহ্‌র জন্য। মানুষ তখন অপরের অধিকার প্রদান করে খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে। আর যখন এই মান তৈরী হয়, তখন শান্তি ও সৌহার্দ্যের ভিত রচিত হয়, এর জন্য চেষ্টা করা এবং এর মান প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুতরাং আঁহযরত (সা.) হলেন সেই সত্তা যিনি আমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে মিলনের পথ দেখিয়েছেন। তাঁর উপর অবতীর্ণ শিক্ষার উপর আমল করেই আমরা পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা সৃষ্টি করতে পারি।

সব সময় মনে রাখা উচিত যে, শান্তির ভিত বাড়ি থেকে শুরু হয়। এরপর

ক্রমশ পাড়া, মফসসল, শহর ও দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত এর পরিধি বিস্তৃত হয়। সুতরাং, প্রতিটি স্তরে যখন একে অপরের আবেগ অনুভুতি এবং অধিকারের বিষয়ে মানুষ যত্নবান হয় তখন শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। আর আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে প্রতিটি স্তরের এই শিক্ষাই আমাদেরকে দান করেছেন। প্রত্যেকটি শ্রেণীর মানুষকে এই শিক্ষা আঁ হযরত দান করেছেন।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে বর্ণনা করতেন। কিন্তু একবার এই বিষয়টি নিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা করেন যার নাম 'আঁ হযরত (সা.) এবং বিশ্ব শান্তি'।

তাঁর সেই প্রবন্ধটি থেকে আমিও কিছু বর্ণনা করব।

এটা তো আমরা দেখি এবং বুঝি যে, শান্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস। শান্তি প্রসঙ্গে আলোচনা হয় আর প্রত্যেকেই বলে শান্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর শান্তি পরিস্থিতিই পরিবারে শান্তি নিরাপত্তার নিশ্চয়তাও প্রদান করে আর আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর প্রত্যেকেরই আকাঙ্খা থাকে সর্বস্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক। কিন্তু কেবল আমাদের বাসনাই শান্তি এনে দিতে পারে না। কেননা এখানেও শান্তির বাসনার মাঝে নিজস্ব স্বার্থ লুকিয়ে থাকে আর এটাই আমরা পৃথিবীতে দেখছি।

যদি স্বার্থপরতা না থাকে তবে কোনও যুদ্ধ হবে না। সচরাচর যখন কেউ শান্তির কথা বলে, তখন তার সেই শান্তি বাসনা থাকে নিজের জন্যই। এমনকি সাধারণত মানুষ যখন দোয়াও করে আর যদি দোয়া নাও করে, তবুও সে একথাই বলে। অর্থাৎ অনেক সময় তার মুখ দিয়ে অন্তরের এই বাসনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাকে এবং আমার স্ত্রী-সন্তানকে এবং আমার নিকটজনদের নিরাপদে রাখে। অপরের নিরাপদ থাকার জন্য এই বেদনা থাকে না কিম্বা মানুষ নিজের জীবন সুখে শান্তিতে কাটানোর জন্য সম্পদের বাসনা করে এবং সম্পদকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, শত্রুদের জন্যও সে সম্পদকে কল্যাণকর মনে করে। বরং সম্পদ নিজের জন্যই সে কল্যাণকর মনে করে। সে যদি সুস্বাস্থ্যকে ভাল মনে করে তবে কেবল নিজের জন্য, শত্রুর জন্যও নয়। সে তো চাইবে শত্রু দুর্বল হোক যাতে সে শত্রুর উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে। অনুরূপভাবে মানুষ সম্মান ও প্রতিপত্তি চায় নিজের জন্য, সকলের জন্য চায় না। মানুষ কখনও চাইবে না, সে যে সম্মানটুকু পাচ্ছে যা অন্য কেউ পাক। পৃথিবীতে এই সব কিছুই আমরা দেখতে পাই, সাধারণ মানুষ থেকে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যেও। আর আমরা নিজেদের দেশেই রাজনীতিকদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব এবং ক্ষমতা লাভের পর নিজেদের দেকে একে অপরের উপর অন্যায়-অত্যাচারের ঘটনা দেখতে পাচ্ছি। একে অপরের বিরুদ্ধে সংঘটিত এই অপরাধগুলি এই মানসিকতারও প্রতিফলন। অতএব, যদি কেবল শান্তির বাসনা থাকে তবে তা অশান্তির কারণ হতে পারে। কেননা, এতে স্বার্থপরতার সংমিশ্রন আছে। কেননা যারা শান্তি চায় তারা এমনভাবে শান্তির বাসনা করে যেখানে কেবল তারা নিজেরা এবং তাদের নিকটজনেরা বা তাদের স্বাজাতি শান্তিতে থাকে। অপরদিকে অন্যদের এবং শত্রুদের শান্তিকে তারা ধুলিস্যাৎ করতে চায়। তাই নিজের জন্য এক মানদণ্ড অপরের জন্য ভিন্ন মানদণ্ড নির্ধারণের নীতি যদি প্রচলন পায় তবে পৃথিবীতে যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে তা পৃথিবীর মুষ্টিমেয় মানুষের জন্য শান্তি হবে, সমগ্র জগতের জন্য শান্তি হবে না। আর যদি সমগ্র জগতের জন্য শান্তি না হয় তবে সেটাকে প্রকৃত শান্তি বলা যাবে না। প্রকৃত শান্তি তখনই হবে যখন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, জাতি ও দেশগত প্রাধান্যের উর্দ্ধে উঠে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হবে, এক নির্দিষ্ট স্থির লক্ষ্য অর্জনের জন্য করা হবে। আর এটা তখনই সম্ভব যখন মানুষ একথা উপলব্ধি করবে যে আমার উপর এক মহান সত্তা বিরাজ করছেন যিনি শুধু আমার জন্যই শান্তি চান না, বরং সমগ্র বিশ্বের জন্য শান্তি চান, যিনি শুধু আমার পরিবার ও দেশের জন্যই শান্তি চান না, বরং সমস্ত দেশের জন্য শান্তি চান। সুতরাং আঁ হযরত (সা.)-এর দেওয়া শান্তির শিক্ষার কেন্দ্রবিন্দু এই চেতনাবোধ তৈরী করে যে, এক মহান সত্তা আমাকে দেখছে যার জন্য আমাকে আমার কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরী করতে হবে। সব সময় এই নীতি অনুসরণ করার জন্য আঁ হযরত (সা.) নির্দেশিত এই সোনালী নীতিকে সামনে রাখতে হবে যাতে তিনি বলেছেন, অপরের জন্যও সেটা পছন্দ কর যা নিজের জন্য পছন্দ কর।

অতএব, এই নীতিকে সামনে রেখে সব সময় মানসিকতা রাখতে হবে যে, আমি যদি শুধু নিজের জন্য বা নিজের জাতি বা দেশের জন্য শান্তির বাসনা করি, তবে সেক্ষেত্রে আমি আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য, সমর্থন এবং সন্তুষ্টি লাভ করতে পারব না।

মানুষ যখন এই বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় যে, সে যা কিছু করবে তা আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্যে করবে, একমাত্র তখনই প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে,অন্যথায় নয়।

সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে আমাদেরকে اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ বলার মাধ্যমে মানুষের উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন আর একথা নিশ্চিত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না উদ্দেশ্য সঠিক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কাজ সঠিক হতে পারে না। উদ্দেশ্যই যদি সঠিক না হয় তবে কাজে বরকত কিভাবে হতে পারে? অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত না উদ্দেশ্য সঠিক হয় কখনও কাজ সঠিক হতে পারে না। কখনই হতে পারে না।

পৃথিবীতে বর্তমানে যতগুলি যুদ্ধ চলছে এবং অরাজকতা বিরাজ করছে, এসবগুলির কারণ হল, মানুষের উদ্দেশ্য সৎ নয়।

মানুষ মুখে যা বলে তার সঙ্গে তাদের বাসনার সামঞ্জস্য নেই আর তাদের যে সব বাসনা রয়েছে সেগুলি তাদের কথা ও কাজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আর বিশ্বজোড়া এই নৈরাজ্যে পরাশক্তি হিসেবে বিবেচিত জাতিসমূহের ভূমিকা বেশি। আজ অবশ্য সারা বিশ্ব যুদ্ধকে খারাপ বলে। প্রত্যেক নেতা এসে বিবৃতি দেয় যে, যুদ্ধ খারাপ জিনিস। কিন্তু এর অর্থ হল, আমাদের বিরুদ্ধে যদি কেউ যুদ্ধ করে তবে সেটা খারাপ। কিন্তু যদি তাদের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু হয় তবে সেটা কোনও খারাপ বিষয় নয়। এই ত্রুটির কারণ হল এদের দৃষ্টি সেই সত্তার দিকে নিবদ্ধ নেই যিনি 'সালাম' (শান্তিদাতা) এবং নিরাপত্তা দাতা। তারা মনে করে, যতক্ষণ আমাদের লাভ, ততক্ষন আমরা শান্তির স্লোগান দিব। কিন্তু যখনই আমাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কথা উঠবে আমরা প্রত্যাখ্যান করব। শত্রুদেরকে সাহায্য করা বা তাদেরকে অস্ত্র সরবরাহ করা আমাদের কাছে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু আমরা যদি কাউকে অস্ত্র দিই, সেই অস্ত্র অত্যাচারের কাজে ব্যবহৃত হলেও তা বৈধ। মানসিকতা যদি এই ধরণের হয় তবে কিভাবে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে?

অতএব, পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি আনার জন্য এই মতবাদ অনুসরণ করতে হবে যে, পৃথিবীর এক খোদা রয়েছেন যিনি চান সকলে শান্তিতে থাকুক।

যখন এই মতবাদ বা বিশ্বাস তৈরী হবে এবং তা অনুসৃত হবে তখনই মানুষর বাসনা স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হবে। বরং পৃথিবীর সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধনকারী হবে। যখন এমনটি হবে, তখন আমাদের চিন্তাধারা এবং শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপনের মান ভিন্ন মাত্রার হবে। তখন আমরা এটা দেখব না যে, অমুক কাজে আমার লাভ হচ্ছে কি না, বরং আমরা দেখব, সমগ্র বিশ্বের উপর এর কি প্রভাব পড়ছে। জগতবাসীরা সব সময় নিজেদের লাভের জন্য অপরের শান্তি নষ্ট করে বেড়ায়। কিন্তু যারা বিশ্বাস করে যে, একজন মহান সত্তা রয়েছেন, তারা কখনও এমন ধৃষ্টতা প্রদর্শন করবে না। কেননা, তারা জানে যে, আমরা এমনটি করলে মহান সত্তা আমাদেরকে পিষে ফেলবে। বস্তুত, প্রকৃত শান্তি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত এক মহান সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয় আর হৃদয়ে তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহ্ তা'লা শান্তি দাতা, এই বিশ্বাস কেবল ইসলাম ধর্ম আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছে।

আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর উপর যে শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন, তাতে বলেছেন

قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ يَّهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ

(আল মায়েদা: ১৬-১৭)

;;;;;; আল্লাহ্ তা'লা এর মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টির অনুসরনকারীদের শান্তি ও নিরাপত্তার পথের দিশা দেখিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা হেদায়াতের জ্যোতি প্রেরণ করেছেন, যাবতীয় বিধিনিষেধ সহকারে একটি কিতাব প্রেরণ করেছেন এবং তাতে শান্তির পথের দিকে স্পষ্ট দিক-নির্দেশনা বর্ণনা করেছেন। এখন যারা এর পূর্ণ অনুবর্তিতা করবে তারাই শান্তির পথের দিশা পাবে। আজ যদি মুসলমানদের মধ্যে নৈরাজ্য ও অশান্তি ও পারস্পরিক যুদ্ধের পরিস্থিতি বিরাজ করে, তবে এটা স্পষ্ট যে এরা আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত ও প্রেরিত গ্রন্থ তথা জ্যোতির সত্যিকার অনুসরন করছে না। অবশ্য তারা রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর প্রতি ভালবাসার দাবি করে। কিন্তু তাদের কর্মপন্থা এর পরিপন্থী। আল্লাহ্ তা'লার কথা কখনও ভুল হতে পারে না। আল্লাহ্ তা'লার কথাও ভুল হতে পারে না। আঁ হযরত (সা.) এর কথা কখনও ভুল হতে পারে না।

মুসলমানদের মধ্যে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা থেকে স্পষ্ট যে, এরা এই 'কিতাবে মুবীন' কে মান্য করার দাবি করে ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে যে শিক্ষা অবতীর্ণ করেছেন তার অনুসরন তারা করছে না। তারা আঁ হযরত (সা.) এর প্রতি ভালবাসার দাবি করে কিন্তু তাঁর আদর্শ ও শিক্ষা মেনে চলে না।

অতএব, আজ আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ দাসের অনুসারীদের কাজ হল সেই শিক্ষাকে নিজেদের জীবনের অঙ্গে পরিণত করা এবং কুরআন করীমের বিধিনিষেধ শিরোধার্য করা। তবেই তো আমরা নিজেদের পরিবেশে শান্তি সৃষ্টি করতে পারব এবং বিশ্বের কাছেও শান্তির বার্তা পৌঁছে দিতে পারব। অন্যথায় বিশ্ববাসী বলবে নিজেদের কথা ও কাজের মধ্যে সামঞ্জস্য তৈরী করুন, তারপর আমাদেরকে উপদেশ দিবেন।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'এখন আকাশের নীচে মাত্র একজনই নবী আছেন, এবং মাত্র একটিই কিতাব আছে; অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.)- যিনি সকল নবীগণের চাইতে উন্নত এবং উত্তম এবং সকল রসুলগণের চাইতে শ্রেষ্ঠতর ও পূর্ণতর এবং যিনি নবীগণের মোহর, মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, যাঁর আনুগত্য করলে খোদা তা'লাকে পাওয়া যায় এবং অন্ধকারের সব আবরণ খসে পড়ে;

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly

BADAR

Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2023 -2025

Vol-8 Thursday, 20 April, 2023 Issue No.16

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 600/- (Per Issue : Rs. 12/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

এবং এই জগতেই প্রকৃত পরিত্রাণ বা নাজাতের চিহ্ন ও প্রভাব প্রকাশিত হয়। এবং কুরআন শরীফ- যার মধ্যে প্রকৃত ও পূর্ণ হিদায়াত নিহিত রয়েছে, তার মাধ্যমে হাক্কানী ইলম ও মারেফাত বা প্রকৃত জ্ঞান ও খোদার উপলব্ধি, প্রজ্ঞা ও পরিচয় লাভ করা যায়, এবং হৃদয় মানবীয় দুর্বলতা সমূহ থেকে মুক্ত হয়, এবং মানুষ অজ্ঞতা ও অলসতা ও সন্দেহ-সংশয়ের আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে পরিত্রাণ পেয়ে যায় এবং হাক্কুল ইয়াকীন বা সত্য ও দৃঢ় বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছে যায়।"

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৫৭-৫৫৮)

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় জ্যোতি রূপে হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) কে এবং এক আলোকিত কিতাব এবং সকল প্রকার জ্ঞান ও মারেফাতের উৎস এবং হেদায়াতের জ্যোতি ও শান্তির বার্তা কুরআন করীম প্রেরণ করে মানবতার উপর বিরাট অনুগ্রহ করেছেন। মানুষ যদি এটিকে কাজে না লাগায় এবং নিজেদের বিনাশকারী ক্ষুদ্র স্বার্থের দাস হয়ে থাকে তবে এর থেকে বড় দুর্ভাগ্য আর কি হতে পারে!

অতএব, যদি নিজেদের পরকাল সুসজ্জিত করতে হয়, শান্তি ও নিরাপদে থাকতে হয় তবে আল্লাহ্‌র সেই বাণীকে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে যা তিনি আঁ হযরত (সা.)-এর উপর অবতীর্ণ করেছিলেন। يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ এই আলোকিত গ্রন্থের পথনির্দেশনাকে সব সময় দৃষ্টিপটে রাখতে হবে এবং পাঠ করতে হবে। একমাত্র তবেই আমরা শান্তির পথের পথিক হতে পারব। এই গ্রন্থের একটি আদেশও এমন নয় যা মানুষো শান্তিকে বিনষ্ট করে। অতএব আজ এই বাণী আপন পর সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের কর্তব্য আর এটিই পৃথিবীর শান্তিরর নিশ্চয়তাদানকারী।

আর এটিই সেই বিপ্লব ছিল যা আঁ হযরত (সা.) তাঁর সম্মানীয় সাহাবাদের মাঝে সৃষ্টি করেছিলেন এবং বাস্তবেও এমন একটি জামাত তৈরী করেছেন যা إِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا (আল ফুরকান: ৬৪)।

এর সত্যায়ন স্থল বানিয়ে দিয়েছিলেন। আর এই অবস্থাই আজ যদি আমাদের মাঝে তৈরী হয়ে যায় আর বিশ্ববাসীদের মাঝে আমরা তৈরী করতে পারি তবে আমাদের বর্তমানও শান্তিপূর্ণ হবে আর ভবিষ্যতও শান্তিপূর্ণ হবে।

অতএব, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের এটি একটি বিরাট দায়িত্ব; যাদেরকে নিজেদের পরিবারিক গণ্ডিতে এবং এবং আশপাশের পরিবেশেও শান্তি ও নিরাপত্তাপূর্ণ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

আর এই কাজ তখনই হবে যখন আমাদের হৃদয়ও ও শুদ্ধ একত্ববাদে পূর্ণ থাকবে আর বিশ্বকেও প্রকৃত একত্ববাদের দিকে নিয়ে আসব।

এটা নিশ্চিত যে, পরিপূর্ণ তৌহিদ প্রতিষ্ঠা ছাড়া শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না।

ইতিপূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে যে, মহান সত্তাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে আর সেই মহান সত্তা হল আল্লাহ্। আর হৃদয়ে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হওয়া ছাড়া তাঁর কথা স্মরণ করা সম্ভব নয়। আর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত না হলে যুদ্ধবিবাদ অব্যাহত থাকবে। যুদ্ধ তখনই থামতে পারে যখন প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববন্ধ সৃষ্টি হবে, পারস্পরিক ভালবাসার পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

ততক্ষণ পর্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যতক্ষন পর্যন্ত না মানুষের মধ্যে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববন্ধন সৃষ্টি হয়। অপরদিকে প্রকৃত ভ্রাতৃত্ববন্ধন এক-অদ্বিতীয় খোদাকে স্বীকার না করে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। এক-অদ্বিতীয় খোদার সঙ্গে সম্পর্ক ছাড়া তৈরী হতে পারেই না। শুধু মান্য করাই নয়, বরং একটা সম্পর্কও স্থাপন করতে হবে এবং এর শিক্ষাও আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমে লাভ করেছি। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- 'আল হামদো লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন'। (সূরা ফাতিহা:২)। কুরআন করীম আমাদেরকে এই শিক্ষা দানের পাশপাশি নামায পড়ারও আদেশও দিয়েছে যাতে মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক পরিসরে ভ্রাতৃত্ববাদের ধারণা তৈরী হয়। 'আল হামদোলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পাঠ করার মাধ্যমে আমাদের মধ্যে এই ধারণার ব্যুৎপত্তি ঘটে যে, আল্লাহ্ তা'লার প্রতিপালনগুণ সমগ্র জগতের উপর পরিব্যপ্ত রয়েছে। এই আয়াতটি পাঠ করে মানুষের চিন্তাধারার বিস্তার ঘটে আর সে সেই খোদার প্রশংসাকীর্তন করে যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক। যিনি খৃষ্টানদেরও প্রতিপালক, হিন্দুদেরও প্রতিপালক, ইহুদীদেরও প্রতিপালক, প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিপালক।মানুষ যখন এই বাণীটি পাঠ করে, তখন কিভাবে সে অপরকে ঘৃণা করতে পারে? একথাই আমি একবার যুক্তরাষ্ট্রে অ-আহমদীদের এক সভায় বর্ণনা করেছিলাম। যা শুনে তাদের প্রতিক্রিয়া ছিল- কি অসাধারণ শিক্ষা! সত্যিকার অর্থেই ইসলামের শিক্ষা এমন যা কখনও একজন প্রকৃত মুসলমানের অন্তরে অপরের জন্য ঘৃণা ও বিদ্বেষ তৈরী করতেই পারে না। 'রাব্বুল আলামীন' শব্দ বন্ধন সমস্ত কিছুকে পরিবেষ্টন করে আছে আর এটাই শান্তি প্রসারের পথকে প্রশস্ত করে। 'আল হামদোলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি সত্যিকার তৌহিদ বা একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত হয় আর যখন রাব্বুল আলামীন' প্রশংসা দ্বারা মানুষের জিহ্বা সিক্ত হয়, তখন খৃষ্টান, হিন্দু, হিন্দু বা অপর কোনও জাতির প্রতি মানুষের মনে বিদ্বেষ থাকা সম্ভবই নয়।

একদিকে মানুষ কারো ক্ষতির আকাঙ্খা পোষণ করে এবং অপরদিকে তাকে দেখে আল্লাহ্ তা'লার প্রশংসাও করে- এমনটা কিভাবে সম্ভব? এটা হতেই পারে না। অতএব, একজন প্রকৃত একত্ববাদীই প্রকৃত শান্তির ধ্বজাবাহক। মুসলমানরা যদি সত্যিকার অর্থে এই বিষয়টি অনুধাবন করতে পারে এবং সেই অনুসারে নিজেদের জীবন পরিচালিত করে, তবে পৃথিবীতে এরাই হবে শান্তিকামী মানুষ। কিন্তু পুনরায় সেই একই কথা ঘুরে ফিরে আসে যে, আঁ হযরত (সা.)-এর একনিষ্ঠ দাসের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়াও জরুরী, একমাত্র তখনই মারেফাত ও তত্ত্বজ্ঞানের সঠিক ব্যুৎপত্তি লাভ হবে।

কিন্তু সেই সঙ্গে আমি একথাও বলব যে এটা আমাদেরও দায়িত্ব যে, আমরা যেন নিজেদের অবস্থার পর্যালোচনা করতে থাকি। এমনটা যেন না হয় যে, আমাদের নামাযে 'আল হামদো লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' পাঠ করা কেবল মুখের কথা হয়ে থাকল আর হৃদয়ের গভীরতায় শুধুই শূন্যতা বিরাজ করছে। যদি মন ও মস্তিষ্কে এর গভীরতা না থাকে, তবে আমরাও নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত হব-শান্তির প্রসারকারী এবং আঁহযরত (সা.)-এর আনীত শিক্ষার অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।

অতএব, অনেক চিন্তার বিষয় এবং চিন্তাভাবনা করার প্রয়োজন।পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা প্রসারের জন্য এক-অদ্বিতীয় খোদার উপর নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করা। খোদা তা'লার ভালবাসাকে নিজেদের হৃদয়ে প্রবিষ্ট করানো, যাতে অন্য কোনও ভালবাসা তার স্থান না নিতে পারে। তাঁর আদেশ পালনের জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর অবতীর্ণ হওয়া শিক্ষা অর্থাৎ কুরআন করীমকে নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করা আজ প্রত্যেক আহমদীর কাজ। যখন আমরা এই মানে উপনীত হব, অর্থাৎ কুরআন করীমের প্রতিটি আদেশ এবং আঁ হযরত (সা.)এর প্রতিটি নির্দেশ আমাদের কথা ও কাজের অংশে পরিণত হবে, একমাত্র তখনই আমরা পৃথিবীকে ইসলামের প্রকৃত বাণী পৌঁছে দিতে পারব, তাদেরকে প্রকৃত শান্তির শিক্ষা দিতে পারব, শুধু তাই নয়, আমাদের নিজেদের কর্মপন্থা দ্বারাও তাদের শেখাতে পারব আর এটাই পৃথিবীতে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যম আর এটাই আঁ হযরত (সা.)কে বিশ্ব-শান্তির মহান ব্যক্তিত্ব প্রমাণের মাধ্যম। এটাই ইসলামের উপর আপত্তিকারীদের মুখ বন্ধ করার মাধ্যম। আজ অবশ্যই এই কাজ মসীহ মওউদ (আ.)-এর জামাতের স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে। আমরাও যদি পারিবারিক স্তর থেকে আন্তর্জাতিক স্তর পর্যন্ত সেই অনুসারে নিজেদের ভূমিকা পালন না করি, তবে আমাদের শান্তিতে থাকার কোনও নিশ্চয়তা নেই আর পৃথিবীরও শান্তিতে থাকার কোনও নিশ্চয়তা নেই। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের মাধ্যমে জগতকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিয়ে নিয়ে আসুক। আল্লাহ্ তা'লা সর্বোত্তম উপায়ে আমাদেরকে এই কর্তব্য পালনের তৌফিক দান করুন।

এখন আমরা দোয়া করব। দোয়ায় সকলে এই দোয়াও করবেন যে আল্লাহ্ তা'লা জলসায় অংশগ্রহণকারী প্রত্যেককে জলসার বরকত দান করুন এবং প্রত্যেককে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দোয়ার ওয়ারিশ করুন। পৃথিবীতে দ্রুত শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থা ফিরিয়ে আনুন যাতে আমরা কোনও প্রকার উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ছাড়া পুনরায় ব্যাপক পরিসরে এবং পূর্ণ বৈভবে জলসার আয়োজন করতে পারি। এবং জলসার মাধ্যমে নিজেদের আধ্যাত্মিকতা ও জ্ঞানের পিপাসা নিবারণ করতে পারি এবং বাস্তবে আমরা আমাদের জীবনকে ইসলামী শিক্ষা অনুসারে পরিচালিত করতে পারি। আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা ও তাঁর অনুগ্রহ অর্জনকারী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফিক দান করুন। দোয়া করে নিন। (দোয়া)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"সেই লোকগুলি তোমাদের আদর্শ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কোন ব্যবসা, বানিজ্য ও কেনাবেচা তাদেরকে আল্লাহ্‌র যিকর বা স্মরণ থেকে বাধা দেয় না।" *(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)*

দোয়াপ্রার্থী: **Nurjahan Begum, Kolkata (W.B)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir